Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120059

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120059

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া জান্নাত, আইডিঃ 23100120059 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাহ" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমাইয়া জান্নাত

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া জান্নাত

আইডিঃ 23100120059

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

টপিক:০১ - সিরাহ অধ্যায়ন করার গুরুত্ব 3

টপিক:০২ - জন্ম থেকে নবুয়ত। শৈশব,পেশা এবং বৈবাহিক জীবন। 7

টপিক: ০৩ - নবুয়ত থেকে হিজরত পর্যন্ত 17

টপিক:০৪ - হিজরতের সময়ে মদিনার সমাজচিত্র । 51

টপিক:০৫ - মদীনার প্রাথমিক দিনগুলো। 53

টপিক:০৬ - বদর যুদ্ধ। 56

উহুদ যুদ্ধ: 59

খন্দক যুদ্ধ: 62

বনু কুরাইযা যুদ্ধ: 65

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ 68

টপিক:০৭ - হুদাইবিয়ার সন্ধি। 70

রাজা বাদশাহের কাছে চিঠি 72

খাইবার যুদ্ধ 74

টপিক:০৮ - মক্কা বিজয়। 79

হুনায়ুন যুদ্ধ 81

তাবুক যুদ্ধ 83

টপিক:০৯ - বিদায় হজ্জ 86

শেষ বিদায়ের কাল 88

টপিক:১০ - নবীজির পবিএ আখলাক ও আমল। 91

টপিক: ১১ - আহলে বাইত স্ত্রী সন্তান ও নাতি নাতনিগন। 95

টপিক:১২ - রাসূল ﷺ এর নামসমূহ, বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক গঠন ও অবয়ব। ... 98

টপিক: ১৩ - রাসূল (সা) এর দিনলিপি ও দৈনন্দিন আমল 106

উপসংহার 110

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যিনি সবকিছুর মালিক।
যিনি আমাদেরকে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন।
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যাকে অনুসরণ করতে পারি পূর্ণাঙ্গভাবে।

শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। তার পরিবার, সাহাবি এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পথ অনুসরণ করবেন সকলের উপর।
সাধারণত দুনিয়াতে যাদেরকে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, অনুসরণীয় ভাবা হয়, তাদের জীবনের সবকিছু আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা আছেই। সেই দিকগুলো তারা প্রকাশ করতে চায় না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক আদর্শ, যার জীবনের প্রতিটি দিকেই চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করা যায় এবং যাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদর্শ মানা যায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে এ বিষয়টি ঘোষণা করে দিয়েছেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

‘অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’
রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। যারা তাঁকে জানেনি, তাঁরা ভালোবাসার নদী দেখলেও মহাসমুদ্র দেখেনি। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

সীরাহ সাবজেক্ট এর প্রতি বরাবরই আমি দূর্বল, এমন একটা টপিক যেখানেই আলোচনা হয় সেখানেই শামিল হতে মন চায়... সীরাহ সাবজেক্ট এর উপর অনেক প্রতিযোগিতা, আলোচনায়, তালিমে, সীরাহ কোর্সে,অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ।

থ্রীসিস এর নোটিশ আসা মাএই এই সাবজেক্টটা কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই এপসেট করে নিয়েছি, অভিজ্ঞতা আছে সাথে মহব্বত রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।ইনশাআল্লাহ আশা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মহব্বতের সাথেই লিখতে পারবো।
আমি এমন এমন টপিক বেচে নিতে চাই রাসুলের জীবনের.. যে অংশগুলো আমায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, আমায় ভাবতে বাধ্য করেছে.. আশা জাগিয়েছে .. অনুভূতি জুগিয়েছে, আমায় হাসিয়েছে, অনেক কাঁদিয়েছে।

যেমন রাসুলের জীবনের জন্ম থেকে নিয়ে শৈশব, পেশা, বৈবাহিক জীবন, নবুয়ত, দাওয়াত, হিজরত, ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার,মক্কী জীবন, বিভিন্ন যুদ্ধ বদর,উহুদ,খন্দক... রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, মাদিনার জীবন, বিদায়বেলা ইত্যাদি।

ফোকাস থাকবে শিক্ষণীয় আকারে প্রতিটি ঘটনা উপস্থাপন করার ইনশাআল্লাহ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাযগণদের প্রতি ৩য় ও ৪র্থ সেমিস্টারের উস্তাযদ্বয়ের প্রতি। বিশেষ করে ৪র্থ সেমির সিরাহের মজলিস কে আমি ভীষণ ভাবে মিস করি। উস্তায এর থেকে "I was inspired by my Ustad's speech in the Seerah class."

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তার নগণ্য বান্দাকে তার শ্রেষ্ঠতম বান্দর জীবনি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার, লেখার তাওফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করার তাওফিক দান করুন আমিন।

টপিক:০১ - সিরাহ অধ্যায়ন করার গুরুত্ব

১। ইসলামের ইতিহাস জানা:

রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

২। রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা:

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদের ﷺ প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজিকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইবাদাত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি ভালোবাসা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে ﷺ সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মাদকে ﷺ ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

৩। সর্বোত্তম আদর্শের অনুসরণ:

ইবন হাজর বলেছেন, 'কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহর ﷺ পথ অনুসরণ করে।' মুহাম্মাদ ﷺ এর ছিল সর্বোত্তম আখলাক। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

৪। কুরআনকে অনুধাবন:

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওয়াহি নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় একই থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময়ে নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।সীরাহ এসব আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ দেয়।এর মাধ্যমে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা সিরাহ থেকে জানা যায়।

৫। মুহাম্মাদের ﷺ জীবন ইসলামি আন্দোলনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত:

রাসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াতের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রথমে তিনি গোপনে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন এবং পরবর্তীতে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ পরিচালনা করেছেন। ইসলামি আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই পর্যায়গুলোর মাঝে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহর ﷺ গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল ওয়াহি দ্বারা নির্দেশিত। নিছক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুটহাট সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ﷺ প্রতিটি পদে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো এলোমেলো বা আকস্মিক ঘটনাবলির সমষ্টি নয়, বরং এ সকল ঘটনা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিকল্পনার অংশ, যাতে দ্বীন ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসব ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব ধাপ অতিক্রম করেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব পর্যায় পার করেছেন সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে।

সীরাহ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সীরাহ সাহাবাদেরকে শিখিয়েছিল কুরআনের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সীরাহ তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মৌখিক নির্দেশ, আর সীরাহ হলো সেই নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন। অন্য নবীদের সীরাহ

সংরক্ষিত নেই, কিন্তু মুসলিমদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি সীরাহও সংরক্ষিত করা আছে।

৬। সীরাহ অধ্যয়ন একটি ইবাদাত:
সীরাহ বিনোদনের জন্য নয়, এটি একটি ইবাদাত। তাই সীরাহ অধ্যয়নের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যে জমায়েতে রাসূলুল্লাহর ﷺ সীরাহ অধ্যয়ন করা হয়, সে জমায়েত আল্লাহর ইবাদত করার জমায়েত, আল্লাহকে স্মরণ করার জমায়েত। আর যে জমায়েতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, ফেরেশতারা সে জমায়েত ঘিরে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন।' আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১।

৭। মুসলিম উম্মাহ-র পুনর্জাগরণের পথ দেখায় সীরাতে রাসূল সাঃ :
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর শোচনীয় অবস্থার উত্তরণকল্পে কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা-সংলাপ-সংগঠন-তত্ত্বের অভাব নেই। অথচ বর্তমান সময়ে এই উম্মাহর অবস্থার উত্তরণ হবে ঠিক সেই পন্থায় যে পন্থায় উত্তরণ হয়েছিল সাহাবীগণের ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের। আর সেই পন্থা জানা ও শেখার জন্য আমাদের ফিরে আসতে হবে সীরাতে রাসূল সাঃ এর কাছে।

৮। রাসূল সাঃ এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সীরাহ-র জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেইঃ
রাসূল সাঃ যেদিন থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন কুরাইশ গোত্র সেদিন থেকেই তাঁর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। রাসূল সাঃ কে অবমাননার এই ধারা বর্তমান যুগেও বহাল আছে। বর্তমান পাশ্চাত্যবিদগণ রাসূল সাঃ কে রক্তপিপাসু, যুদ্ধবাজ, নারীলোভী ইত্যাদি নানাবিধ অপবাদ আরোপ করেই যাচ্ছে এবং অনেক মুসলিমও অজ্ঞতাবশত তাদের এই অপপ্রচারের শিকার হচ্ছে। তাই এসব অবমাননার বেড়াজাল থেকে রাসূল সাঃ এর সম্মান রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে রাসূল সাঃ এর জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। অন্যথা, আমরাও পাশ্চাত্যবিদদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাব।

৯। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় মনোবল (তাওয়াক্কুল) রাখার শিক্ষা আমরা পাই সীরাহ থেকেঃ

সীরাহতে আমরা দেখি যে, রাসূল সাঃ সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে দাওয়াতের কাজ করে গেছেন। হিজরতের সময় যখন তিনি আবু বকর রাঃ কে নিয়ে সাওর গুহায় লুকিয়ে ছিলেন তখন কুরাইশ কাফেরর একেবারে গুহার দরজার গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তা দেখে আবু বকর রাঃ চিন্তায় পেরেশান হয়ে পড়লে রাসূল সাঃ তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন "দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

১০। সীরাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধভাষী, সদালাপী ও উন্নত আখলাকের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা দেয়ঃ

আমরা সীরাহতে দেখব যে, রাসূল সাঃ এর ভাষাশৈলী ও বাচনভঙ্গি কতটা উন্নতমানের ও বিশুদ্ধ-প্রাণবন্ত ছিল। প্রথম দর্শনেই যে কেউ তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি অপ্রয়োজনে যেমন কথা বলতেন না তেমনি প্রয়োজনীয় কথাও অনর্থক দীর্ঘ করতেন না। তাঁর ভাষণ ছিল সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এবং শ্রোতাদের জন্য আকর্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি তিনবার বলতেন যেন শ্রোতারা ভালোভাবে বুঝতে ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি তিনি যখন কথা বলতেন তখন সাহাবীগণ এমনভাবে নিশ্চুপ থেকে শুনতেন যে মনে হত তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। কখনও কখনও তাঁর বক্তব্য শুনে সাহাবীগণ কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন আবার কখনও কোন সুসংবাদ পেলে খুশিতে সশব্দে তাকবীর দিয়ে উঠতেন।

একজন সচেতন সীরাহ পাঠকের অবশ্য কর্তব্য হল সীরাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের ভাষাশৈলী, বাচনভঙ্গি ও সার্বিক আখলাককে রাসূল সাঃ এর আদলে সাজানো।

টপিক:০২ - জন্ম থেকে নবুয়ত। শৈশব,পেশা এবং বৈবাহিক জীবন।

আবদুল্লাহ ও আমিনা:

কুরাইশ গোত্রের প্রধান আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মহৎ ব্যক্তি। তাঁর দশ পুত্র ছিল, যাদের প্রত্যেকেই সৌন্দর্য, বীরত্ব এবং শৌর্য-বীর্যে মানুষের মধ্যে মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন এক উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর কোমলতা, বিনয় ও সৌন্দর্য ছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।তাই আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বিয়ে দিলেন আমিনা বিনতে ওয়াহাবের সঙ্গে। আমিনা ছিলেন বনু যুহরা গোত্রের সর্দার ওয়াহাবের কন্যা। সেই সময়ে কুরাইশদের মধ্যে আমিনা ছিলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান নারী। বংশ মর্যাদা, শিষ্টাচার ও গুণাবলী তাঁকে সব নারীর মাঝে বিশেষ স্থান দিয়েছিল।

তাঁর এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করলেন আবদুল্লাহ। তখন আমিনা তাঁর গর্ভে সেই মহামানবকে বহন করে ছিলেন—যিনি অনাগত দিনে বিশ্বজুড়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেবেন। তাঁর অন্তরে তখন থেকেই অলৌকিক অনুভূতির উদয় হতে লাগল। তিনি দেখতে পেলেন কিছু আশ্চর্য নিদর্শন—যা তাঁর ভ্রূণের বিশেষ মাহাত্ম্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সংকেত দিয়ে যাচ্ছিল।

জন্ম ও বংশধারা :

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিন এলো। আমুলের ফিলের বছর সোমবার খ্রীষ্টীয় ৫৭০ সাল। মক্কার আকাশে উদিত হলো এক নতুন আলো। এ দিনটি ছিল সৃষ্টির পর থেকে সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তগুলোর একটি। সূর্যের আলো যেন সেদিন অন্যরকম উজ্জ্বলতায় পৃথিবীকে আলোকিত করে ফেলেছিল। ধরণীর প্রতিটি কোণায় কোণায় যেন বেজে উঠেছিল শান্তির সুরধ্বনি।

যাঁর আগমনে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, সেই নবি এলেন ধরণিতে। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু কা'ব ইবনু লু'য়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহর ইবনু মালিক ইবনু নজর ইবনু কিনানা ইবনু খুযাইমা ইবনু মুদরিকা ইবনু ইলইয়াস ইবনু মুদার ইবনু নিযার ইবনু মা'দ ইবনু আদনান। আদনানের বংশধারা শেষ হয় ইবরাহীম {আ.}-এর পুত্র সাইয়্যেদুনা ইসমাঈল {আ.}পর্যন্ত।

যখন নবি {সা.}-এর জন্ম হলো, তাঁর মা আমিনা এই আনন্দ সংবাদ পাঠালেন আবদুল মুত্তালিবের কাছে। বললেন, 'আপনার জন্য এক পুত্রসন্তান এসেছে।'আবদুল মুত্তালিব আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। নবজাতকের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরে কোলে তুলে নিলেন। তাঁকে নিয়ে প্রবেশ করলেন কাবা শরীফে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়ালেন।সেই নবজাতকের নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ' {সা.}। এটি ছিল অনুপম এক নাম—যা আরবদের মধ্যে ছিল অপরিচিত।
তাই তারা বিস্মিত হলো।

নতুন বিশ্বের জন্ম:
সীরাত-লেখকগণ এবং হাদীস বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখ করেছেন, নবি {সা.} জন্মের সময় সময় এমন কিছু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল, যা মানবিকতার ঊর্ধ্বে। এসব ঘটনা এক নতুন বিশ্বের সূচনা এবং নব অধ্যায়ের ইঙ্গিত বহন করে। ধর্ম, নৈতিকতা, মানবতা ও ভবিষ্যতের পথে এক নতুন অগ্রগতি নির্দেশ করে। এটি ছিল এক যুগসন্ধি। পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম চিন্তায় পারদর্শীগণ এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম। মুজিযাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পারস্যের রাজপ্রাসাদের কম্পন। এর ফলে কিসরার চতুর্দশ মিনারের পতন ঘটে। এ ছাড়া, শুকিয়ে যায় সাওয়া হ্রদ। নিভে যায় সেই পারস্যের অগ্নিশিখা, যা হাজার বছর ধরে তাদের উপাসনার প্রতীক হিসেবে জ্বলে আসছিল।

দুগ্ধপান এবং বক্ষ-বিদারণ:
প্রথমে নবি {সা.}-কে দুধ পান করান আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা। এর কিছুদিন পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্য মরুপ্রান্তরের এক ধাত্রী খুঁজতে শুরু করেন। আরবদের প্রথা অনুযায়ী, নবজাতকদের প্রাথমিক লালনপালন ও শুদ্ধ ভাষা চর্চার দূরবর্তী মরুভূমিতে পাঠানো হতো। কারণ, মরুর নির্মল বাতাস, সরল জীবনযাপন এবং সভ্যতা থেকে দূরে থাকার কারণে শিশুর মানসিক ও শারীরিক গঠন পোক্ত হতো। বাচ্চারা স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চেতা এবং সাহসী মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠত। মরুর ভাষাও ছিল শুদ্ধ ও সাবলীল—যা ভবিষ্যতে সুস্পষ্ট বাকশক্তির জন্য সহায়ক। মরুভূমির বিখ্যাত বনু সাদ গোত্রের ধাত্রীরা এই সময় মক্কায় এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হালিমা সাদিয়া। তিনি তাঁর গোত্রের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে এসেছিলেন শিশুর সন্ধানে। এ সময়ে মরুপ্রান্তরে চরম খরা ছিল।

চরম দারিদ্র্য ও কষ্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন হালিমা। তাঁর পরিবারের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাঁদের উট ও গাধাগুলো ছিল দুর্বল। দুধে বরকতের প্রাচুর্য ছিল না। এই কঠিন সময়ে হালিমা একটি শিশুকে দুধপান করানোর মাধ্যমে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় ছিলেন। নবি (সা.)-কে একে একে সকল ধাত্রীদের সামনে আনা হলো। কেউই আগ্রহী হলেন না। কারণ, এই শিশুটি ইয়াতিম। ধাত্রী নারীরা প্রত্যাশা করতেন, শিশুর বাবার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের হাদিয়া-তোহফা পাবেন। তাই তারা চিন্তা করলেন, "এ তো এতিম শিশু! তাঁর মা আর দাদা কি আমাদের উপযুক্ত বিনিময় দিতে পারবেন?" ফলে সবাই তাঁকে এড়িয়ে গেল।

হালিমাও প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে তাঁর মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি তৈরি হলো। আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে নবিজির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। তাঁর মনে হতে লাগল—এই শিশুটিকে গ্রহণ করলে হয়তো তাঁর জীবনটা পাল্টে যাবে। অন্য কোনো শিশুকে না পেয়ে, হালিমা শেষমেষ নবিজির কাছেই ফিরে এলেন এবং তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নবি (সা.)-কে নিয়ে হালিমা যখন নিজের ঘরে ফিরলেন, তখন থেকেই বরকতের আলামত স্পষ্ট হতে লাগল। তাঁর দুর্বল উটনীর উলানে হঠাৎ করেই দুধের প্রাচুর্য দেখা দিল। গাধাটিও যেন অদ্ভুতভাবে শক্তি ফিরে পেল এবং দ্রুততার সাথে চলতে লাগল। বাড়ির অন্যান্য গবাদি পশুগুলোরও দুধ ও খাদ্যে বরকত হলো।

হালিমার পরিবার এবং চারপাশের সবাই অবাক হয়ে গেল এই পরিবর্তন দেখে। সবাই বলল, "হালিমা, তুমি এমন এক শিশুকে নিয়েছো, যে মহান আশীর্বাদপুষ্ট!"এই বরকতের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। হালিমার সঙ্গীরা তাঁকে দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগল। নবিজির আগমনে হালিমা সাদিয়া এবং তাঁর পরিবার যে শান্তি, আনন্দ ও বরকতের সন্ধান পেল, তা যেন মহা সৌভাগ্যের এক অধ্যায় হয়ে রইল। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজির প্রতি বরকত ও কল্যাণের ধারা অব্যাহত ছিল। তাঁর দুই বছর কাটল বনু সাদের প্রান্তরে। এরপর হালিমা দুধপান থেকে বিরতি দিলেন। নবিজি তখন এমনভাবে বেড়ে উঠেছিলেন, যা তাঁর বয়সের শিশুদের থেকে আলাদা ছিল। হালিমা তাঁকে তাঁর মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে আনলেন। তবে তাঁকে আরও কিছুদিন নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সম্মতি দিলেন আমিনা। নবিজি আবারও ফিরে গেলেন হালিমার কাছে। একদিন বনু সাদের প্রান্তরে খেলছিলেন প্রিয়নবি (সা.)। তখন তাঁর কাছে দুইজন ফেরেশতা এলেন। তাঁরা নবিজির বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডের ভেতর

থেকে এক কালো পদার্থ বের করে ফেলে দিলেন। এরপর তা পাকসাফ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। নবি (সা.) ছোটবেলায় তাঁর দুধভাইদের সঙ্গে মিলে পশুপালনের কাজ করতেন। মরুপ্রান্তরের সরল জীবন, সহজাত বিশুদ্ধতা, এবং বনু সাদ গোত্রের প্রমিত ভাষার মাঝে তিনি বড় হতে থাকলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, "আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কারণ, আমি কুরাইশ বংশের সন্তান এবং আমাকে দুধপান করানো হয়েছিল বনু সাদ গোত্রে।"

মা ও দাদার মৃত্যু এবং চাচার আশ্রয়ে:

নবিজির পিতা আবদুল্লাহ তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করেন। তিনি শাম থেকে ফিরে আসার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মদীনায় তাঁর মামারা থাকতেন। তিনি ফিরতি পথে সেখানে যান, এবং যুবক বয়সে মদীনাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। নবি (সা.)-এর বয়স তখন কত, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ওয়াকিদি বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ (২৫) বছর। তবে কিছু সূত্রে এই বয়সের চেয়ে কম উল্লেখ করা হয়েছে।যখন নবিজির বয়স ছয়, মা আমিনা তাঁকে নিয়ে রওনা হলেন মদীনার দিকে। সেখানে নবিজির দাদার নানাবাড়ি ছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং প্রিয় স্বামী আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিবের কবর যিয়ারতে গিয়েছিলেন আমিনা।ফেরার পথে, মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি 'আবওয়া' স্থানে আমিনার মৃত্যু হয়। নবিজির জন্য তা ছিল এক চরম শোকের মুহূর্ত—মায়ের থেকে বিচ্ছেদ এবং প্রিয়জনের হঠাৎ চলে যাওয়া। এটি ছিল তাঁর জীবনের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়—

যা তাকে প্রাকৃতিকভাবেই কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল। এ ঘটনায় আল্লাহর গভীর শিক্ষা ও গূঢ় রহস্য ছিল। আমিনা মারা যাওয়ার পর উম্মে আইমান নামক একজন হাবশি দাসী নবিজিকে নিয়ে মক্কায় আসেন। তিনি তাঁকে দাদার কাছে পৌঁছে দেন। আর আবদুল মুত্তালিব অনেক স্নেহের সাথে তাঁকে পালন করতে থাকেন। তিনি কাবার ছায়ায় নিজের বিছানায় বসিয়ে নাতিকে আদর করতেন। এক সময় নবিজি (সা.) পৌঁছলেন আট বছর বয়সে। এই সময়ে তাঁর দাদা মারা গেলেন।এটি ছিল নবিজির দ্বিতীয় বড় শোকের মুহূর্ত, যা প্রথমটির চেয়েও কঠিন ছিল। কারণ, তিনি কখনো তাঁর পিতাকে দেখেননি, তাঁকে অনুভব করতে পারেননি। সুতরাং, তাঁর পিতার মৃত্যু ছিল একটি তাত্ত্বিক শোক। তবে দাদার মৃত্যু ছিল এক অনুভূতির শোক, যা তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল। দুটির মধ্যে পার্থক্য ছিল বিশাল।

নবি-জীবনের এক হৃদয়গ্রাহী অধ্যায় হলো তাঁর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা। আবু তালিব ছিলেন আবদুল্লাহর সহোদর। নবিজিকে তিনি তাঁর সন্তানদের থেকেও তাঁকে বেশি স্নেহ করতেন। বাল্যকালে তাঁর কাছে সবচেয়ে নিরাপদ এবং স্নেহের আশ্রয়ে থাকতেন প্রিয়নবি। আবু তালিব তাঁর ব্যাপারে এতটাই সচেতন ছিলেন যে, শত দুঃখ-কষ্টেও নবিজির যত্নআত্তির কোনো ত্রুটি করতেন না। তাঁর স্নেহডোর ছিল অতুলনীয়, যা অন্য সকল সম্পর্ক থেকে আলাদা।

পাদরি বুহায়রার ঘটনা:

নবিজির বয়স তখন নয়। আবু তালিব তাঁকে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজে শামে যাত্রা করলেন। নবিজির তখন বয়স অল্প। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা সফরসঙ্গী করতে তাঁর চাচাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবু তালিব ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তাঁর সফরগুলোর গুরুত্ব ছিল অনেক। অপরদিকে নবিজির মাঝে ছিল বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি। ফলে তাঁর প্রতি আবু তালিবের দয়া ও ভালোবাসা ছিল গভীর। তাঁর চাচা তাঁকে সঙ্গী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেন তাঁর জীবনের সমস্ত বাধা ও বিপদে তিনি একসঙ্গে থাকেন। তাঁরা বুসরা নামক শহরে পৌঁছালেন। সেখানে এক খ্রিষ্টান সাধু (বুহায়রা) বাস করতেন। তিনি ছিলেন একটি প্রাচীন গির্জার সন্ন্যাসী। তিনি তাঁর মধ্যেই থাকতেন এবং নিজের গির্জার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁর সময় কাটাতেন। নবিজিকে দেখে তিনি চরম বিস্মিত হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, ওই ছোট্ট ছেলেটি কোনো সাধারণ শিশুর মতো নয়। তাঁর মধ্যে কোনো অদ্ভুত আলোক রশ্মি ছড়াচ্ছিল, যা দেখে সন্ন্যাসী তাঁর সত্তার গভীরতা অনুভব করতে পারলেন। বুহায়রা বুঝতে পারলেন—এটি কোনো সাধারণ শিশু নয়। তাঁর মধ্যে আছে একজন মহামানবের লক্ষণ, যিনি বিশ্বকে এক নতুন পথের দিশা দেখাবেন। তিনি আবু তালিবকে সাবধান করে বললেন, "তোমার ভাতিজার মধ্যে অনেক বড় কিছু গুণ আছে। সে খুব বড় মিশন সফল করবে। সাবধান! ইহুদিরা কিন্তু তাঁকে (হত্যা) করতে চাইবে।" বুহায়রা আরও বললেন, "তোমার ভাতিজা এই পৃথিবীকে এক নতুন আধ্যাত্মিক আলো দিয়ে পূর্ণ করবেন। তাঁকে নিরাপদে রাখো, এবং তাঁর প্রতি যত্নবান হও।" এরপর, তিনি আবু তালিবকে বললেন, "এখনো সময় আছে, তুমি তাঁকে নিয়ে স্বদেশের দিকে ফিরে যাও। মক্কায় চলে যাও।"

এই কথামালার মধ্যে ছিল এক গভীর প্রজ্ঞার ছাপ। বুহায়রার এই আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্বাণী নবিজির জন্য এক অপূর্ব সম্মান এবং গুরুত্ব বহন করেছিল। নবি (সা.)-এর মধ্যে ছিল এমন মহত্ত্ব, যা স্রেফ আল্লাহ-প্রদত্ত। আবু তালিব নবিজিকে

নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।কিন্তু এই সফরটি নবি-জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে রইল। কারণ এতে তাঁর বিশেষ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এই ঘটনাটি কেবল নবিজির জীবনেই নয়, বরং পুরো মানবতার জন্য এক মহান বার্তা এনে দিয়েছিল। পৃথিবীকে সত্য এবং ন্যায়ের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ শিক্ষা ও পরিচর্যা:

রাসূলুল্লাহ{সা.}-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ সুরক্ষা দিয়েছিলেন। জাহিলিয়াতের মন্দ অভ্যাস ও নোংরামি থেকে তিনি সবসময় দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন তাঁর জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। সর্বোত্তম শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড লজ্জাশীলতা। কথা-বার্তায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় সত্যবাদী এবং আমানতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিশ্বস্ত। এই কারণে, তাঁর জাতির মধ্যে তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত বলা হতো। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সবসময় রক্ষা করতেন, যাতে তিনি জাহিলিয়াতের কোনো নিন্দনীয় আচরণে লিপ্ত না হন।

তাঁকে দূরে রেখেছেন, যেগুলো তখনকার সমাজে স্বাভাবিক বলে মনে করা হতো। তিনি ছিলেন আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণকারী, অন্যের বোঝা লাঘবকারী, অতিথিদের সম্মানকারী এবং সৎকর্মে সাহায্যকারী।তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সামান্যতেই তৃপ্ত থাকতেন। যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বা পনেরো, তখন কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে ফিজার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। রাসূলুল্লাহ {সা.}এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের চাচাদের জন্য তীরের জোগান দেন। এভাবেই তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর মধ্যে বীরত্ব ও সাহসিকতার গুণাবলি গড়ে ওঠে।যখন রাসূলুল্লাহ {সা.}কিছুটা বড় হলেন, তখন তিনি জীবিকার্জনে মনোযোগ দিলেন। তিনি বকরি চরাতেন। এতে ছিল সম্মানজনক রোজগার, আত্মার প্রশিক্ষণ, এবং দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতির চর্চা। এর মাধ্যমে বুনো প্রাণীদের পরিচালনা করার কৌশল, নির্মল বাতাসে শ্বাস নেওয়া, এবং শরীরকে শক্তিশালী করাও সম্ভব হতো। সবচেয়ে বড় কথা, এটি ছিল নবিদের আদর্শের অনুসরণ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বলেছিলেন, "প্রত্যেক নবিই বকরি চরিয়েছেন।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনিও কি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিও।" রাসূলুল্লাহ {সা.}নিজের দুধভাইদের সঙ্গে বনু সাদ গোত্রে বকরি চরাতেন। তাই এ কাজ তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না।

‘সহিহ’ হাদিসে উল্লেখ আছে, তিনি মক্কায় কিরাতের বিনিময়ে বকরি চরাতেন, যা তিনি এর মালিকদের কাছ থেকে পেতেন।

খাদিজার সাথে বিবাহ:

রাসূলুল্লাহ {সা.}-এর বয়স তখন পঁচিশ। তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ {রা.}-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। খাদিজা {রা.}ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে মর্যাদাবান নারী, যাঁর ছিল অসীম বুদ্ধিমত্তা, নিষ্কলুষ চরিত্র এবং বিশাল ধনসম্পত্তি। ছিলেন বিধবা। তাঁর স্বামী আবু হালাহর যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর।খাদিজা ছিলেন প্রজ্ঞাবান ব্যবসায়ী—যাঁর খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। তিনি পুরুষদেরকে তাঁর ব্যবসার কাজে নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের লাভের কিছু অংশ দিয়ে থাকতেন। কুরাইশ ছিল এক বাণিজ্যিক জাতি। খাদিজার ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতা তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিল। একবার, খাদিজা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর বাণিজ্যিক সফরে পাঠান। রাসূল (সা.) শাম থেকে ফেরার পর তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সদয় চরিত্রের কথা শোনা যায়—যা খাদিজাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি বুঝতে পারেন, রাসূল (সা.)-কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন; বরং একজন অত্যন্ত সৎ এবং মহাপ্রাণের অধিকারী। রাসূল (সা.) এর সততা ও মানবিক গুণাবলী খাদিজাকে এতটা মুগ্ধ করে যে, তিনি নিজে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এর আগে অনেক কুরাইশ নেতা তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খাদিজা নিজেই রাসূল (সা.)-এর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হামজা এবং আবু তালিব এর মাধ্যমে তাঁদের বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে, তাঁদের মধ্যে মানবিক এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সম্মানের এক উজ্জ্বল প্রতীক। খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রথম স্ত্রী। একেবারে শুরুতে ইসলাম প্রচারের কষ্টকর সময় থেকে তিনি রাসূল (সা.) এর পাশে ছিলেন সবসময়। ছিলেন একজন অবিচলিত সহযাত্রী এবং সাহসী সমর্থক। খাদিজা (রা.) ছিলেন সেই মহীয়সী নারী, যাঁর সাহসিকতা, ত্যাগ ও ভালোবাসায় রাসূল (সা.) এক নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে এই সম্পর্ক ছিল অমর—যা ইসলামের ইতিহাসে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবরাহীম (আ.) ছাড়া রাসূল (সা.) এর সমস্ত সন্তানের জন্ম হয় খাদিজা (রা.)-এর মাধ্যমে। তাঁর সাথে রাসূল (সা.) এর সম্পর্ক ছিল প্রেমময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবীর জন্য যা আলোর পথের দিশারি।

কাবা পুনঃনির্মাণ এবং বিরোধ মীমাংসা:

রাসূলুল্লাহ{সা.}-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হলো। কুরাইশরা কাবা পুনঃনির্মাণের পরিকল্পনা করল। তারা কাবা সংস্কারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কারণ কাবা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত, এবং এর ভিত কিছুটা পুরোনো পাথরের স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

মাটির ব্যবহার ছাড়াই পাথরগুলো একের ওপর এক সাজানো হয়েছিল। এর উচ্চতা ছিল অনেক। সুতরাং, ভেঙে নতুনভাবে নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল।যখন তারা পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু করল এবং কাবার কোণায় পৌঁছাল, তখন একটি বিতর্ক দেখা দিল। বিতর্কের বিষয় ছিল হাজার-আসওয়াদ। প্রতিটি গোত্র চাইছিল এই পাথরটি তাদের গোষ্ঠীই তুলে রাখুক। তারা প্রত্যেকেই এই সম্মান দাবি করছিল। এইভাবে, পুরো কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হলো—যা প্রায় যুদ্ধের রূপ নিতে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে একটি সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারা সিদ্ধান্ত নিল, প্রথম যে-ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবে। তখন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম মসজিদে প্রবেশ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে দেখে বলল, “এটি তো আল-আমিন, আমরা খুশি তাঁর ফয়সালায়।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি কাপড় নিয়ে কালো পাথরটি ধরলেন এবং বললেন, “প্রত্যেক গোত্র এক-একটি প্রান্ত ধরুক এবং একসঙ্গে এই পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে যাক।” সবাই একসঙ্গে পাথরটি তুলে নিয়ে গেল এবং যখন পাথরটি যথাস্থানে পৌঁছাল, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সেটি স্থাপন করলেন। এভাবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যুদ্ধ প্রতিরোধ করলেন। এটি ছিল তাঁর বিচক্ষণতার একটি উদাহরণ। এর বিস্তারিত প্রমাণ তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মানুষের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ঝগড়াঝাঁটি দূর করার মাধ্যমে চাক্ষুষ দেখিয়েছিলেন। তাঁর দয়া, মর্মব্যথা এবং আলোচনার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীজুড়ে অটল রহমত হয়ে উঠলেন। যার সুফল পেয়েছিল কুরাইশরাও।

হিলফুল ফুজুল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হিলফুল ফুজুল-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল মক্কার সবচেয়ে সম্মানিত চুক্তিগুলোর একটি। ঘটনা এমন ছিল যে, যাবিদ এলাকার এক বণিক মক্কায় কিছু পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। তা কিনেছিলেন আস বিন ওয়ায়েল কুরাইশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু তিনি দাম পরিশোধ করেননি। যাবিদ এলাকার ব্যক্তিটি তার

অধিকার ফিরে পেতে কুরাইশের নেতাদের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। কিন্তু তারা আস বিন ওয়ায়েলের মর্যাদার কারণে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল। তখন লোকটি মক্কার সবার কাছে সাহায্য চাইলেন। যাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ছিল, তারা পাশে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। এটি শুনে মক্কা শহরের কিছু নৈতিক ও সাহসী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে জমা হলেন আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের বাড়িতে। সেখানে তারা একে অপরকে শপথ নিতে বললেন যে, তারা মিথ্যা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। নির্যাতিতদের তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন।

কুরাইশরা এই চুক্তিটিকে 'হিলফুল ফুজুল' বলে অভিহিত করেছিল। এরপর তারা আস বিন ওয়ায়েলের কাছে গিয়ে যাবিদ এলাকার ব্যক্তিটির পণ্য তার কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই চুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত খুশি ছিলেন এবং এটির প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "আমি আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের বাড়িতে একটি অঙ্গীকারে শরীক ছিলাম। আমি তা এতটাই পছন্দ করি যে, যদি আমাকে তার বিনিময়ে লাল উটনীর মতো কিছু দেওয়া হত, তাও আমি তাতে অংশগ্রহণ করতাম। যদি ইসলামি যুগে এমন চুক্তি হত, আমি অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করতাম।

এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল, যারা অন্যায় করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং নির্যাতিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

অজানা উদ্বেগ এবং নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মধ্যে একটি অজানা উদ্বেগ অনুভব করতেন। এই উদ্বেগের উৎস বা পরিণতি তিনি জানতেন না। তাঁর মনে কখনো এমন কিছু আসেনি যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মহান উপহার হিসেবে ওহী এবং নবুওয়াত পাবেন। এমন কিছুর কথা তিনি কখনো ভাবেননি বা স্বপ্নেও দেখেননি।

জন্ম থেকে নবুওয়াত: আমাদের জন্য শিক্ষা:

ঌউত্তম বংশমর্যাদা ও শিষ্টাচার: রাসূল {সা.}-এর মা-বাবা এবং বংশধারা ছিল আরবের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এটি শিক্ষা দেয় যে, সমাজ সংস্কারের জন্য পারিবারিক ঐতিহ্য এবং শৈশব থেকেই উন্নত শিষ্টাচার বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য (এতিম জীবন): জন্মের আগে পিতা এবং শৈশবে মাতাকে হারানো সত্ত্বেও তিনি ভেঙে পড়েননি। তাঁর এই এতিম জীবন আমাদের শেখায় যে, প্রতিকূল পরিবেশ একজন মানুষকে মানসিকভাবে দৃঢ় ও স্বাবলম্বী করে তোলে।

শ্রমের মর্যাদা ও অভিজ্ঞতা অর্জন: তিনি কিশোর বয়সে বকরি চরিয়েছেন এবং পরবর্তীতে ব্যবসা করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, কোনো হালাল কাজই তুচ্ছ নয়। বকরি চরানোর মাধ্যমে তিনি ধৈর্য এবং নেতৃত্ব দেওয়ার প্রাথমিক গুণাবলি অর্জন করেছিলেন।

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা (আল-আমিন): নবুওয়াতের আগেই তিনি মক্কায় 'আল-আমিন' বা পরম বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রথম শর্তই হলো কথায় ও কাজে সত্যবাদী হওয়া, যাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই তাকে বিশ্বাস করতে পারে।

সামাজিক সংস্কার ও আর্তমানবতার সেবা: তরুণ বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' চুক্তিতে অংশ নিয়ে মজলুমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং সমাজসেবামূলক কাজে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঈমানের দাবি।

বিচক্ষণতা ও বিরোধ মীমাংসা: হাজার-আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কাবার পুনঃনির্মাণকালে কুরাইশদের মধ্যে তৈরি হওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তিনি নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এটি নেতৃত্ব ও সংকটের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক কালজয়ী শিক্ষা।

নির্জনতা ও আত্মচিন্তা (হেরা গুহার নির্জনতা): নবুওয়াতের ঠিক আগে তিনি হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এটি শেখায় যে, মহান কোনো কাজের আগে আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং গভীর চিন্তার জন্য নির্জনতা ও আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া প্রয়োজন।

টপিক: ০৩ - নবুয়ত থেকে হিজরত পর্যন্ত

সুখের আগমন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হলো। পৃথিবী তখন এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সমাজে প্রোথিত অসংখ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞতা। মানুষ নিজেদের ধর্মের মূল থেকে বিচ্যুত। পুরো পৃথিবী যেন বিপথগামীদের পথ অনুসরণ করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, আল্লাহর রহমত আসার সময় ঘনিয়ে আসলো। অন্ধকারে নতুনআলো ফুটল। সমাগত হলো সুন্দরের পথ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে তাঁর চারপাশের সমাজের অবস্থা দেখছিলেন, তা তাকেগভীর উদ্বেগে ফেলে দিয়েছিল। তিনি দেখছিলেন, মানুষের মধ্যে বিরাজমাননানান বিভ্রান্তি। তারা প্রকৃত পথ থেকে সরে যাচ্ছিল। মূর্তিপূজা, অজ্ঞতা এবং ন্যায়বিচারের অভাব—সব কিছুই তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল। তাঁর মনে হতো,এই পৃথিবীকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু করতে হবে।

এই উদ্বেগের মধ্যে তিনি একাকী সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। শহর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি একাকী শান্তি খুঁজতেন। তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে পাহাড়, উপত্যকা বা কোনো নির্জন স্থানে চলে যেতেন—যেখানে একাকী বসে চিন্তা করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার বিভিন্ন অঞ্চল ও তার আশপাশের উপত্যকাগুলো অতিক্রম করতেন, তখন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন। গাছপালা এবং পাথরের খণ্ডগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। তারা তাকে সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানাতো। তাদের কাছ থেকে ভেসে আসত এক মধুর আওয়াজ—"আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!" অর্থাৎ, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সালাম।"

তিনি এই আওয়াজ শুনে ডানে-বামে-সামনে ও পেছনে তাকাতেন। কিন্তু কোথাও কোনো মানুষ দেখতে পেতেন না। শুধু গাছপালা এবং পাথরের টুকরো। ছাড়া কিছুই চোখে পড়ত না।

প্রথম যে বিষয়টি শুরু হয়েছিল তা হলো সত্য স্বপ্ন। তিনি কোনো স্বপ্ন দেখলে, সকাল বেলার সূর্যালোকের মতো তা পরিষ্কার এবং সঠিক হতো।

তিনি প্রায়ই হেরা গুহায় একা সময় কাটাতেন। সেখানে টানা কয়েক রাত অবস্থান করতেন। যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে যেতেন এবং টানাইবাদত করতেন।

তিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসরণে, সঠিক দ্বীন এবং এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে দোয়া করতেন

নবুওয়াত লাভ:

পবিত্র রমজান মাসের ১৭ তারিখ।যেদিনটির জন্য প্রতীক্ষা ছিল—তা এসে পৌঁছাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের এক বিশেষ মুহূর্ত। এটি ছিল তাঁর জন্মের ৪১ তম বছর, ৬০৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট ৬ তারিখ। তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমণ করলেন এবং বললেন: "পড়ো।" মুহাম্মদ ﷺ বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" ফেরেশতা তাঁকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন। এতে তাঁর শ্বাসরুদ্ধনল হবার উপক্রম হলো। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো।" আবারও তিনি একই উত্তর দিলেন, "আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশতা তৃতীয়বার তাঁকে একইভাবে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে। পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

এটি ছিল নবুয়তের প্রথম দিন এবং আল্লাহ-প্রদত্ত প্রথম বাণী।

খাদিজার ঘর:

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এর আগে কখনো এমন কিছু তাঁর সঙ্গে ঘটেনি। এমন কিছু শোনারও অভিজ্ঞতা ছিল না।

নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কেরামদের সময় বহু যুগ আগেই অতিবাহিত হয়েছে। তাই তাঁর মনে বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে তিনি দ্রুত ঘরে ফিরেন। তাঁর শরীর কাঁপছিল ভয়ে। ঘরে পৌঁছেই তিনি খাদিজা (রাযি.)-কে বলেন, “আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও! আমি বিপদে পড়েছি।”

খাদিজা (রাযি.) ভয়ের কারণ জানতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সবকিছু খুলে বলেন। খাদিজা (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সচেতন। নবুওয়াত, আম্বিয়া ও ফেরেশতাদের সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানতেন। তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নওফল (যিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আসমানি কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতেন)-এর কাছে যেতেন। তিনি মক্কার লোকদের অন্যায় ও অসংগত আচরণ

ভালোভাবে জানতেন। এসব যে কোন সৎ ও বিবেকবান মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না!

খাদিজা (রাযি.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন এমন একজন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নবিজির ব্যক্তিগত জীবন ও বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে গভীর ধারণা ছিল তাঁর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁর একান্ত সম্পর্ক ছিল—যা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কে নিখুঁত উপলব্ধি দিতে সাহায্য করেছিল। তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কাজ এমনকি প্রতিটি শব্দ ও স্বভাব তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের স্মারক।

খাদিজা (রাযি.) দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর মদদপুষ্ট মহাপুরুষ হয়েছেন। তিনি আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা। তাঁর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি এমন যে, এগুলো কখনো শয়তানের প্ররোচনা হতে পারে না। তিনি জানতেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ মহান, সৎ ও কল্যাণকামী। তার ওপর আল্লাহর রহমত ও দয়া অটুট থাকবে।

তিনি বললেন, "না! আল্লাহ কখনো আপনাকে অসম্মান করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়দের সহায়তা করেন, দরিদ্রদের সাহায্য করেন, অতিথি সেবা করেন এবং সত্যের পথে যেকোনো কষ্ট সহ্য করেন

এটি ছিল খাদিজার কথা। যিনি সঠিক বিবেক, বিশুদ্ধ প্রকৃতি এবং জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এসব বলেছিলেন। তিনি জানতেন মানুষ সম্পর্কে।

তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল নির্ভরযোগ্য। তবে বিষয়টি ছিল আরো গভীর এবং এর জন্য একজন এমন ব্যক্তির প্রয়োজন—যিনি ধর্ম, নবুওয়াত এবং ঐতিহ্যের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এমন একজনের প্রয়োজন—যিনি আসমানি কিতাব ও আসমানি ধর্ম সম্পর্কে জানেন। এরই প্রেক্ষিতে, খাদিজা (রাযি.) সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কাছে যাবেন।

খাদিজা (রাযি.) নবিজিকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। নবি ﷺ যা যা দেখেছিলেন, ওয়ারাকাকে জানালেন। তখন ওয়ারাকা বললেন, "আপনার জীবন যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর শপথ! আপনি এই জাতির নবি। আপনার কাছে যা এসেছে, তা ঠিক তেমনি, যে বিশাল বার্তা মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে দেওয়া হয়েছিল। আপনার জাতি আপনাকে অস্বীকার করবে। আঘাত করবে। আপনাকে তাড়িয়ে দেবে এবং যুদ্ধ করবে।"

তাঁর জাতি তাঁকে তাড়িয়ে দেবে—এ কথা শুনে নবি ﷺ খুবই অবাক হলেন। কারণ তিনি জানতেন, কুরাইশের কাছে তাঁর মর্যাদা কতটা উঁচুতে। তাঁরা তাঁকে এক 'সত্যবাদী' এবং 'বিশ্বাসযোগ্য' ছাড়া কিছু বলতো না। সেজন্য তিনি অবাক হয়ে বললেন, "তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, এমন কোনো ব্যক্তি কখনো আসেনি, যে আপনার মতো ওহি নিয়ে এসেছে, অথচ মানুষ তাঁকে শত্রু বলে গণ্য করেনি এবং তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। যদি আমি সে দিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, তবে আপনাকে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করব।"
এরপর কিছু সময়ের জন্য ওহি থেমে গেল। তারপর তা পুনরায় শুরু হলো। এবং কুরআন নাযিল হতে লাগল।

ইসলাম-গ্রহণের ধারা:
খাদিজা (রাযি.) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তিনি সর্বদা নবি ﷺ-এর পাশে থাকতেন, তাঁকে সাহস দিতেন, তাঁর মনোবল দৃঢ় করতেন এবং মানুষের আচরণের কষ্ট কমানোর চেষ্টা করতেন।
এরপর আলী (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকতেন। কেননা, আবু তালিব পরিবার তখন কঠিন সময় পার করছিল। রাসূল ﷺ তাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।
এর বাইরে যায়দ ইবন হারিসা (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর পালক-পুত্র ছিলেন। এই তিনজনের ইসলাম গ্রহণ ছিল রাসূল ﷺ-এর সত্য ও সততার প্রমাণ। তারা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ, যারা তাঁর চরিত্র ও সততা ভালোভাবে জানতেন। তাঁদের কাছে রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত গুণাবলী জানা ছিল।
আবু বকর ইবনু আবী কুহাফা (রাযি.) ছিলেন মক্কার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর ছিল অমূল্য মানবিক গুণাবলী। তাঁর বিচক্ষণতা, মিতব্যয়িতা ও মধ্যপন্থী মনোভাব তাকে মক্কার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। মক্কার সমাজে তাঁর সম্মান ছিল সর্বজনবিদিত। কারণ তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত বণিক। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো চলত। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর শিষ্টাচার, সৎ আচরণ এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি। মক্কার ইতিহাস, বিশেষত কুরাইশের বংশের বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান। তিনি সাধারণত সবার সাথে সহজ-সরল ভাষায় কথা বলতেন এবং সবাই তাঁর ব্যাপারে আস্থা রাখত।

আবু বকর (রাযি.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সমাজে একটি বিশাল পরিবর্তন ঘটে। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের পথে পা বাড়ান। তাঁর ইসলাম গ্রহণ শুধু নিজের বিশ্বাসের প্রতিফলন ছিল না, বরং মক্কার সমাজের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক শক্তিশালী সূচনা।
ইসলাম গ্রহণের পর, তিনি তাঁর আশেপাশের সকলকে আল্লাহর পথে আহ্বান শুরু করেন। মক্কার যেসব মানুষজন তাঁর কাছে আসতেন, তাঁরা আবু বকর (রাযি.)-এর মুখ থেকে ইসলামের সততা শুনে আগ্রহী হতেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের পথে অন্যদেরকে আহ্বান করার জন্য এক উজ্জ্বল পথিকৃৎ হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর অন্তরের দৃঢ়তা এবং ইসলামের প্রতি নিবেদিত আত্মবিশ্বাস তাকে মক্কার অন্যান্য নেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে।
তাঁর এই পবিত্র উদ্যোগ কেবল তাঁর বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেনি, বরং সবার মধ্যে ঈমানের আলো ছড়াতে সাহায্য করেছে।
আবু বকর (রাযি.)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করলেন কুরাইশের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাদের মধ্যে ছিলেন উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, সাআদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাযি. আনহুম)। এই সম্মানিত ব্যক্তিরা একে একে ইসলামের পথে হাঁটলেন।
আবু বকর (রাযি.) তাঁদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন। আরও অনেক মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম, উসমান ইবনু মাযউন, উবায়দাহ ইবনু হারিস ইবনুল মুত্তালিব ইবনু আবদে মানাফ, সাঈদ ইবনু যায়দ, খাব্বাব ইবনু আরত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আম্মার ইবনু ইয়াসির, সুহাইব এবং আরও অনেকে। ধীরে ধীরে মক্কায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকল। পুরুষ ও নারীরা একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। ইসলাম ও তার শিক্ষার কথা ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি গলিতে।

সত্যের প্রথম ঘোষণা সাফা পর্বতে:
প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচারের কাজটি গোপনে করতে শুরু করেন। তিনি ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে লাগলেন। তবে তা ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে—জনসমক্ষে নয়। এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল তিনটি বছর। এরপর,

আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এলো। তাঁকে এখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

"সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

"আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো। আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত করো।"^

وَقُلْ اِنِّىْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۚ

"আর বলো, 'নিশ্চয় আমিই সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বের হলেন এবং তিনি সাফা পাহাড়ের শিখরে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন—ইয়া সাবাহা। এটি ছিল এক পরিচিত ও সাধারণ আহ্বান। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হলে এটা ব্যবহারকরা হতো। তাদের ওপর যদি অতর্কিত হামলা হতো, তারা এই শব্দে সবাইকে সতর্ক করত।

কুরাইশ তৎক্ষণাৎ এই আহ্বানে সাড়া দিল এবং দ্রুত জমায়েত হতে লাগল।কেউ কেউ প্রতিনিধি পাঠাল, কেউ বা সরাসরি উপস্থিত হলো।

তখন রাসূলুল্লাহ

ﷺবললেন, "হে বনু আবদুল মুত্তালিব,হেবনু ফিহর, হে বনু কাব যদি

আমি আপনাদের বলি যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে কিছু ঘোড়া আপনাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে, তাহলে কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন?"

আরবরা ছিল খুবই বাস্তববাদী এবং অভিজ্ঞ। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সততা, বিশ্বস্ততা এবং পরামর্শের অভিজ্ঞতা পেয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারল, যিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি পাহাড় থেকে সামনে ও পেছনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, যা তারা নিজের চোখে দেখতে পারছেন না। তাই তারা সরাসরি

বলল, "হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি।"

এরপর যখন প্রথম অংশটি শেষ হলো এবং সবাই বিশ্বাসের সাথে কথা শুনল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আপনাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির আগমনের খবর দিচ্ছি।

দাওয়াত ও তালিমের প্রগাঢ় জ্ঞান:

এটি ছিল নবুওয়াতের মর্যাদা ও গুরুত্বের পরিচায়ক। এর মাধ্যমে রহস্যময় বাস্তবতা এবং আল্লাহপ্রদত্ত ইলমের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ছিল একটি উপদেশ ও সতর্কতা। এমন এক বিচক্ষণতা ও বোধ—যা ধর্মীয় এবং নবুওয়াতের ইতিহাসে একেবারে অনন্য। এমন পথ বা এমন উপায় আর কিছুই ছিল না, যেমনটি এই পথটি ছিল। এর চেয়ে সহজ আর কিছু ছিল না। এই বক্তব্য শুনে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবু লাহাব বলল: "আজ সারা দিন তোকে অভিশাপ।

কেবল একথা বলার জন্যই কি আমাদের ডাকলিস!"

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এক অপূর্ব বিচক্ষণতায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু তাদের নিজেদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। এই শত্রু তাদের ঘরের ভেতরে অপেক্ষা করছে, এবং এটির মোকাবেলা করা তাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন। তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন, আল্লাহ সম্পর্কে অবগত না থাকা, তাঁর গুণাবলী ও নাম জানার অভাব, শিরক ও মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হওয়া, আত্মিক ও শারীরিক তৃষ্ণার দিকে প্রবৃত্ত হওয়া, কুসংস্কার এবং অমূলক ধারণায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং সীমা অতিক্রম করা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

অনেক বেশি ক্ষতিকর—আক্রমণের আশায় ওঁৎ পেতে বসে থাকা শত্রুদলের সৈন্য বাহিনী অথবা একটি সূক্ষ্ম আক্রমণ থেকেও।

আবু তালিবের সহানুভূতি ও কুরাইশের শত্রুতা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। সত্য প্রকাশ করলেন। কুরাইশরা প্রথমে কিছু বলল না। কিন্তু যখন তিনি তাদের মূর্তির প্রতি কটাক্ষ করলেন, তখন তারা তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করল। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল।

তবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিব।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থামলেন না, তিনি তাঁর মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। একসময় কুরাইশের কিছু নেতারা আবু তালিবের কাছে এসে বলল, "আপনার ভাতিজা আমাদের দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেছে, আমাদের ধর্মকে গালমন্দ করেছে।

আপনি যদি তাঁকে থামাতে না পারেন, তবে আমরা কি করতে পারি? আপনি তো আমাদের ধর্মই অনুসরণ করো।" আবু তালিব খুব নম্রভাবে তাদের বললেন,

“আমি কিছু করতে পারি না, তবে তাঁকে আমি রক্ষা করব।” কুরাইশরা তখন হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

শুরু হলো কুরাইশের মধ্যে আলোচনা ও গুঞ্জন। তারা সবাই রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা ও শত্রুতা প্রচারের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। পুনরায় কুরাইশরা আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল: “আপনি একজন অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি, আমাদের কাছে আপনার বিশেষ সম্মান রয়েছে। আমরা আপনাকে আগেও বলেছিলাম, কিন্তু আপনি কিছুই করেননি। আল্লাহর কসম! এখন পর্যন্ত যেটুকু ধৈর্য আমরা ধারণ করেছি, তা আর চালিয়ে যেতে পারব না। আমরা আমাদের দেবতাদের দোষারোপ সহ্য করতে পারছি না। হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে থামান, নতুবা আমাদের মধ্যে কোনো একটি পক্ষ নিন। নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকবে।”

আবু তালিবের জন্য তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতাকে মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শত্রুদের কাছে সঁপে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনোভাবেই সম্মত হতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর ভাতিজাকে ডেকে বললেন, “ভাতিজা আমার! কুরাইশের লোকেরা এসে আমার কাছে এই নালিশ দিয়েছে। একটু দেখো, নিজের জীবনের কথা ভাবো। আমি এমন একটি বোঝা বহন করতে পারব না—যা আমার সাধ্যের বাইরে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, আবু তালিবের মনে দোলাচল কাজ করছে। তিনি হয়তো মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং তাকে সহায়তা করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। চাচার মনের এই টানাপোড়েন উপলব্ধি করে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, “হে চাচা! আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবুও আমি এই কাজ ত্যাগ করবো না। আল্লাহ তাআলা নিজেই একে পূর্ণতা না দেওয়া পর্যন্ত কিংবা এ পথে আমি শহীদ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাব।”

এই কথা বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অশ্রুসিক্ত হলেন। তাঁর চোখ বেয়ে নেমে আসা অশ্রু যেন অন্তরের গভীর বেদনার প্রতিচ্ছবি। ভিজে ওঠা চোখ নিয়ে তিনি ফিরে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ঠিক তখনই আবু তালিব তাকে পেছন থেকে ডেকে বললেন, “ওহে আমার প্রাণপ্রিয় ভাতিজা, ফিরে এসো!”

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবের কাছে ফিরে এলেন। আবু তালিব সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “যা তোমার ইচ্ছা, তাই বলো। তোমার পথে আমি কোনো বাধা হতে

পারবো না। আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমাকে বিপদের মুখে একা ফেলে দেব না। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন তোমার রক্ষাকবচ হয়ে তোমার পাশে থাকবো।" আবু তালিবের এই অটল দৃঢ়তা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন রাসূলুল্লাহ ﷺ মনকে শক্তি দিল। তিনি বুঝলেন, আল্লাহর এই মহৎ দায়িত্ব পালনে চাচা সবসময় তাঁর পাশে থাকবেন, বিপদ এলে তাঁরই রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।

সাহাবিদের ওপর দুঃসহ নির্যাতন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর পথে দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। কুরাইশরা তখন বুঝতে পারল, তাদের পক্ষে তাঁকে দাওয়াত থেকে ফেরানো বা আবু তালিবকে তার সঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করা সম্ভব নয়।

তাই তারা প্রতিহিংসার আঘাত বর্ষণ শুরু করল সেই সমস্ত দুর্বল মুসলমানদের ওপর, যাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিল না। প্রতিটি গোত্র নিজেদের মুসলিম সাথির ওপর নির্যাতন চালাতে লাগল। কেউ তাদের বেঁধে রাখত, কেউ দিনের পর দিন অভুক্ত রেখে কষ্ট দিত, আবার কেউ তাদেরকে প্রখর রোদের মধ্যে মক্কার উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখত। মক্কার মরুভূমির উত্তপ্ত বালু যেন আরও রক্তাক্ত আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তগুলোতে।

এই নির্যাতিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিলাল হাবশি (রাযি.)। বিলাল ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে নির্মম নির্যাতন করতে লাগল। যখন সূর্যের তাপ চারপাশের জিনিসকে উত্তপ্ত করে তুলত, তখন উমাইয়া তাঁকে মাঠে নিয়ে যেত। তাঁর উন্মুক্ত দেহকে উল্টো করে গরম বালুর

ওপর ফেলে রাখা হতো। এরপর তাঁর বুকের ওপর বিশাল একটি পাথর এনে চাপানো হতো। যেন তিনি নড়তেও না পারেন। উমাইয়া তাকে বলত, "তুমি যদি লাত ও উজ্জার পূজা না করো এবং মুহাম্মাদকে অস্বীকার না করো, তাহলে তোমার মৃত্যু আসবে এই কষ্ট সহ্য করতে করতে।"

সেই কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও বিলাল (রাযি.) দৃঢ়তার সাথে একটিই বাক্য উচ্চারণ করতেন, "আহাদ, আহাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। যেন তাঁর অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে গাঁথা ছিল।

একদিন এই করুণ দৃশ্য দেখে আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) চোখের পানি আটকাতে পারলেন না। তিনি উমাইয়াকে চড়া দামের বিনিময়ে বিলালকে মুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন। উমাইয়া রাজি হয়ে গেল এবং আবু বকর (রাযি.) বিলালকে মুক্ত করলেন।
বিলাল সেদিন কেবল এক গোলাম হিসাবে নয়; বরং আল্লাহর পথে অবিচলতার এক প্রতীক হিসাবে স্বাধীনতা পেলেন।
মক্কায় মাখযুম গোত্র আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাযি.) ও তাঁর পরিবারকে প্রতিনিয়ত অমানুষিকভাবে নির্যাতন করত। আম্মার, তাঁর পিতা ও তাঁর মা—এ পরিবারটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। প্রখর রোদের মধ্যে তাদের টেনে বের করে এনে, মক্কার উত্তপ্ত বালুর ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হতো।
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদের এই অবস্থায় দেখতে পেতেন, তাঁর কষ্ট হতো। তাঁদের উৎসাহ দিতে তিনি বলতেন, "ধৈর্য ধর, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমাদের প্রতিশ্রুতি হলো জান্নাত।"
অত্যাচারের তীব্রতায় আম্মারের মা শহীদ হন। তবুও তিনি ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন, ইসলাম ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান
মক্কার আরেক তরুণ ছিলেন মুসআব ইবনু উমাইর (রাযি.)। সৌন্দর্য, যুবকোচিত গৌরব, এবং বিলাসিতায় সমৃদ্ধ। তাঁর মা ছিলেন ধনী, আর তাই তিনি মুসআবকে অত্যন্ত সুন্দর ও নরম পোশাক পরাতেন। মক্কার সুগন্ধের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন তিনিই। তাঁর জন্য মায়ের ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাঁর পায়ে থাকত দামি নকশাদার পাদুকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রসঙ্গে একদিন বললেন, "মক্কায় মুসআবের মতো লম্বা, সুদর্শন, আর বিলাসি পোশাকে সজ্জিত আর কাউকে দেখিনি।"
একসময় মুসআব (রাযি.) জানতে পারেন, নবিজি ﷺ ইসলাম প্রচার করছেন। আর এই দাওয়াত চলছে আরকাম ইবনু আবিল আরকামের ঘরে। মুসআব সেখানে গিয়ে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তা তাঁর মা ও গোত্রের কাছ থেকে ঈমানের বিষয়টি লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয় উসমান ইবনু তালহা একদিন মুসআবকে নামাজ পড়তে দেখে ফেলে। আর খবরটি তাঁর মা ও গোত্রের কাছে পৌঁছে দেয়।
সাথে সাথে মুসআবকে ধরে নিয়ে গিয়ে গৃহবন্দি করা হয়। হাবশায় হিজরতের আগ পর্যন্ত তাঁর এই বন্দি-জীবন কাটে। পরে মুসআব হাবশা থেকে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর মায়ের স্নেহ আর বিলাসিতা ছেড়ে তিনি অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কিছু কিছু সাহাবি তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় কুরাইশ নেতাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এক ধরনের সুরক্ষা পেলেও পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় তা আঘাত হানত।

এর মধ্যে উসমান ইবনু মাযউন (রাযি.) ছিলেন এমনই এক দৃঢ়প্রাণ সাহাবি। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন ধনী ও প্রভাবশালী নেতা ওয়ালিদ ইবনু মুগীরার কাছে। ওয়ালিদ তাঁকে রক্ষা করছিলেন ঠিকই, কিন্তু একসময় উসমানের হৃদয়ে এক অদৃশ্য যন্ত্রণার জন্ম হয়। তাঁর মনে হয়, তিনি যেন আল্লাহর অধীনে না থেকে অন্যের আশ্রয়ে আছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে এমন দ্বিধায় ফেলে যে, একদিন তিনি

ওয়ালিদের কাছে গিয়ে সরাসরি বলেন, "আমি আপনার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে চাই। আমি চাই একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমার আশ্রয় থাকুক।"

এরপর একদিন এক মুশরিকের সঙ্গে তাঁর তর্ক বাঁধে। যা এতদূর গড়ায় যে ওই মুশরিক তাঁর মুখে এমন আঘাত করে বসে যে, তাঁর চোখ ফুলে ওঠে। ওয়ালিদ দূর থেকে এই ঘটনা দেখছিলেন। অশ্রু ভেজা কণ্ঠে তিনি বললেন, "ভাতিজা, তুমি তো আমার আশ্রয়ে ছিলে! এমনটি এড়ানো সম্ভব ছিল। কিন্তু তুমি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

উসমান (রাযি.) দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আল্লাহর শপথ, যদি আমার অন্য চোখেও আঘাত লাগত, তবুও আমি আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার হিসেবে মেনে নিতাম। আমার এখন এমন এক আশ্রয় রয়েছে, যা আপনার আশ্রয় থেকেও অনেক শক্তিশালী।"

ইসলাম গ্রহণের পর উসমান ইবনু আফফান (রাযি.)-এর জীবনেও ঘটে যায় করুণ এক অধ্যায়।

তাঁর চাচা হাকাম ইবনু আবিল আস তাঁকে বন্দি করে রাখেন। কঠোর শপথ করে বলেন, "তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছো? আল্লাহর কসম, তুমি যদি এই পথ থেকে সরে না আসো, তবে তোমাকে মুক্তি দেবো না।"

উসমান (রা) দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, "আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই এই দ্বীন ত্যাগ করব না।" তাঁর চাচা যখন দেখলেন, তার এই কঠোর আচরণও তার ঈমানকে টলাতে পারছে না, তখন তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

আরেক সাহসী সাহাবি খাব্বাব ইবনু আরত (রা)। তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা তো আরও বেদনাদায়ক। তিনি নিজেই বলেন, "একদিন আমাকে ধরে নিয়ে আগুনের ওপর ফেলে দেওয়া হয়। তারপর একজন মুশরিক আমার বুকে পা রাখে, ফলে আমার পিঠের

চামড়া পুড়ে যায়। তপ্ত কয়লার ওপর আমি এমনভাবে পুড়তে থাকি যে, ঠান্ডা মাটির স্পর্শও আমার শরীরে ছিল না।"

তাঁর পিঠে জমে থাকা দাগগুলো কষ্ট ও ত্যাগের চিহ্ন হয়ে রইলো। এগুলো আল্লাহর পথে তাঁর কৃত-প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিত। তিনি তাঁর ঈমানের পথে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছিলেন। রাসুল ﷺ-এর এসব সঙ্গী আল্লাহর ভালোবাসায় এতটাই অবিচল ছিলেন যে, শত জুলুম-নির্যাতনেও তাঁদের পা এক চুল টলেনি।

তাঁদের এই বেদনাবিধুর কাহিনি যেন গোটা ইতিহাসকেই কাঁদিয়ে দেয়।রাসূলের বিরুদ্ধে শত্রুতা কুরাইশরা যখন তরুণ সাহাবিদের দ্বীনচ্যুত করতে ব্যর্থ হল, তখন তারা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তাদেরকে বিরত রাখার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে মূর্খরা নানান অপপ্রচার শুরু করল। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিল। যাদুকর, কবি, এমনকি পাগল বলে আখ্যা দিল। তারা তাঁর প্রতি নির্যাতনের নানা পদ্ধতি বের করল এবং যতোভাবে সম্ভব তাকে কষ্ট দিতে লাগল।

একদিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হিজরের কাছে বসেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ কাবাঘর তাওয়াফ করতে গিয়ে তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাচ্ছিল্যের সুরে তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা কথা বলতে লাগল। একবার-দুইবার এমন বলার পর, তৃতীয়বার রাসুলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, "শোনো, হে কুরাইশগণ! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের জন্য ধ্বংস বহন করে এনেছি।"

তাঁর কথায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে কোনো কথা ফুটল না। বরং তারা ভয়ে নম্রভাবে কথা বলতে লাগল।

পরদিন যখন তাঁরা একই জায়গায় বসে ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আবার তাঁদের সামনে এলেন। এবার সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে ঘিরে ধরল।

একজন এসে তাঁর চাদরের প্রান্ত ধরল। এমন অবস্থায় আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করতে চাও, যে বলে আমার রব আল্লাহ?"

তারা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে ছেড়ে আবু বকর (রা)-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেদিন আবু বকর (রা)-এর মাথা তারা ফাটিয়ে দিল। তাঁর দাড়ি ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে বের করে দিল। তারা তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করতে করতে থাকল। এই অবস্থায় আবু বকর (রা) বাড়ি ফিরেন। তাঁর মুখ ও মাথা ফুলে গিয়েছিল।

আবু বকরের সাথে কুরাইশদের ব্যবহার কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের চাপ সৃষ্টি করল। একদিন আবু বকর (রা) আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সময়ে, তারা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করল। কেউ তাঁকে পেটাচ্ছিল। কেউ তাঁকে হেনস্তা করছিল। শরীরের একেবারে কোনো অংশ অবশিষ্ট ছিল না যেখানে আঘাত পৌঁছায়নি। বিশেষ করে, উতবা ইবনু রবীআ তাঁকে দুটি খোলা জুতা দিয়ে পিটিয়ে মুখ বিকৃত করে দিল। এমনকি তার চেহারা একেবারে চিনতে পারার মতো ছিল না।

আবু বকর (রা) অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। তাঁর শরীর পুরোপুরি ক্ষত- বিক্ষত। তার মুখ পুরোপুরি ফুলে গিয়েছিল। বনু তামিম গোত্রের মানুষ তাকেদেখে মনে করেছিল যে, তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না। তবে, জ্ঞান ফিরলে আবু বকর (রা)-এর মনে একটাই চিন্তা—রাসুলুল্লাহ ﷺ কোথায়। তিনি মায়ের কাছে জানতে চাইলেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ কেমন আছেন?"

এমন অবস্থায়, তাঁর মা তাকে কিছু দিতে চাইলেন। খাবার ও পানি দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আবু বকর (রা) একবারও তার দিকে তাকালেন না। তিনি শুধু রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। তাঁর মা 'উম্মুল খায়ের' তাঁর অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, "এত কষ্ট পেয়েছো, তুমি কি একটু বিশ্রাম নিবে না?" কিন্তু আবু বকর (রা) বললেন, "না মা, আমি জানি না রাসুলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন। আমি শুধু তাঁর কথাই ভাবছি।"

সে মুহূর্তে উম্মু জামীলের কাছে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা জানতে চান। উম্মু জামিল তখন বললেন, "আপনার মা এখানে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন।" আবু বকর রা. বললেন, "তিনি শুনলে কোনো ক্ষতি নেই।" উম্মু জামিল বললেন, "তিনি ভালো আছেন। সহীহ-সালামতেই আছেন।"

আবু বকর (রা) বললেন, "যতক্ষণ না আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হতে পারি, ততক্ষণ আমি দানাপানি গ্রহণ করব না।" একটু থেমে যাওয়ার পর চারপাশ নীরব হয়ে আসল। লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য, তাঁরা একত্রে আবু বকর (রা)-কে ধরে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এলে আবু বকর (রা)-এর অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করলেন। নবীজির দোয়া আর আহ্বানে আবু বকর (রা)-এর মা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

কুরাইশদের ভ্রান্তি ও অত্যাচার:

কুরাইশরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল, কিভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কুৎসা রটাবে। কিভাবে তাকে আটকাবে। যাতে কেউ তাঁর কাছে না আসে, বা তাঁর কথা না শোনে। বিশেষ করে দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষেরা যেন তাঁর কাছে না ভিড়ে।

তারা একত্রিত হয়েছিল ওয়ালিদ ইবনু মুগীরার কাছে। তিনি তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে হজ উপলক্ষে অনেক লোক আসছিল। ওয়ালিদ তাদের বললেন, "হে কুরাইশ! হজ্জের মৌসুম এসে গেছে। অনেক আঞ্চলিক প্রতিনিধি এখানে আসবে। তারা এই ব্যক্তির সম্পর্কে শুনে এসেছে। এজন্য এই লোকটি সম্পর্কে এমন কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যাতে তোমরা পরস্পর মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না হও। তোমরা সবাই একই কথা বলো।"

তারা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল, কিন্তু ওয়ালিদ তাদের কোনো মতামতই সম্মত হলেন না। অবশেষে তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আপনি কী বলেন, হে আবু আবদ শামস?" ওয়ালিদ বললেন, "সবচেয়ে কাছের ও সহজ উত্তর হবে—

মুহাম্মদ একজন যাদুকর! সে এমন যাদু নিয়ে এসেছে, যা মানুষকে বাবা, ভাই, স্ত্রী, এবং পুরো পরিবার থেকে আলাদা করে দিতে পারে।" কুরাইশরা এই বক্তব্য নিয়ে শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানেই হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ হতো, তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে সতর্ক করত।

কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে অত্যাচার করতে কোনো কার্পণ্য করেনি। তাদের নিষ্ঠুরতার কোনো সীমা ছিল না। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ককেও কোনো দাম দেয়নি। অত্যাচারের সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে সিজদায় ছিলেন। তাঁর চারপাশে কয়েকজন কুরাইশী ছিল, যারা তাঁর প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এমন সময় উকবা বিন আবি মুআইত অতি নির্মমভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে একটি উটের নাড়ীভুঁড়ি ফেলে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ সিজদায় ছিলেন, মাথা ওঠাননি। তাঁর পিঠে এই গ্লানি, অশ্রদ্ধা এবং অপমানের বোঝা। তবুও তিনি মাথা তোলেননি। তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন।

এমন অবস্থায় তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) এসে নাড়ীভুঁড়ি সরিয়ে নেন। দুঃখ, ক্ষোভ যন্ত্রণার মধ্যে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি চোখে জল নিয়ে সেই নীচ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে বদদোয়া করতে লাগলেন। এর পরে রাসুলুল্লাহ নিজে তাদের

বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। যেন আল্লাহ তাঁদের উপযুক্ত বিচার করেন। এই ঘটনা কেবল শারীরিক আক্রমণ ছিল না। বরং নবিজীর সম্মান এবং দ্বীনের প্রতি নির্মম আঘাত করেছিল কুরাইশরা।

হামযার ইসলাম গ্রহণ:

আবু জাহল সাফা পর্বতের পাদদেশে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তাঁর প্রতি নানা অপমানজনক কথা বলল এবং গালিগালাজ করল। রাসুলুল্লাহ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। কিছুক্ষণ পর আবু জাহল চলে গেল।

এদিকে, হামযা (রা) সেদিন তাঁর শিকার থেকে ফিরছিলেন কাঁধে তিরধনুক নিয়ে। গর্বিত পদচারণায়। পথিমধ্যে, আবদুল্লাহ ইবনু জাদ'আনের বাঁদী হামযাকে সেই আক্রমণের কথা জানালেন। এই বাঁদীটি সব ঘটনা দূর থেকে দেখেছিল।

এর পরেই হামযার অন্তরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তিনি তিরধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে, তীব্র গতিতে মসজিদের দিকে ছুটে যান। সেখানে আবু জাহল কয়েকজন লোকের সাথে বসে ছিল।

হামযা (রা) আবু জাহলের কাছে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ধনুক দিয়ে আবু জাহলকে আঘাত করলেন। তাতে আবু জাহলের মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। হামযা (রা) বললেন, "তোর এত বড় সাহস, তুই মুহাম্মদকে গাল-মন্দ করিস ও কটুকথা বলিস! শুনে রাখ, আমি তাঁর দ্বীনের ওপর আছি। তিনি যা বলেন, তা আমিও বলি।"

আবু জাহল চুপ হয়ে গেল। এই ঘটনার পরেই হামযা ইসলাম গ্রহণ করেন। হামযার ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের জন্য ছিল বড় ধাক্কা। কারণ তিনি ছিলেন কুরাইশ গোত্রের অন্যতম প্রভাবশালী এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাঁর এই পদক্ষেপ কুরাইশদের জন্য অনেক কষ্টের ছিল।

নবিজির সাথে উতবার কথোপকথন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারী দিন দিন বাড়তে লাগল। কুরাইশদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল। তারা চিন্তা করল কিভাবে বিষয়টির মোকাবিলা করা যায়। একদিন আরবের নেতা উতবা ইবনু রাবিআ কুরাইশদের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। তিনি মূলত

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান। তার আশা ছিল, হয়তো কিছু শর্ত মেনে তিনি থেমে যাবেন। কুরাইশরা তাকে অনুমতি দিল।

উতবা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বসে বললেন, "ভাতিজা! তুমি আমাদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু তুমি এমন এক বিষয় নিয়ে আসলে, যা আমাদের সবাইকে বিভ্রান্ত করছে। আমাদের ঐক্য নষ্ট করছে। আমাদের ধর্ম ও দেবতাদের নিয়ে তোমার পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অবমাননা করা হয়েছে। আমি তোমার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই। তুমি তা গ্রহণ করবে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বলুন, হে আবুল ওয়ালিদ! আমি শুনছি।" উতবা বললেন, "যদি তুমি এই কাজের মাধ্যমে টাকা কামানোর চেষ্টা করো, আমরা তোমাকে আমাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি দিয়ে দেব। যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাও। আর যদি মর্যাদা চাও, আমরা তোমাকে আমাদেরনেতা বানাবো। আমাদের কোনো কাজ তোমার অনুমতি ছাড়া হবে না। যদি তুমি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাবো। আর যদি তোমার এই উপদেশ কোনো রহস্য বা ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমাদের সম্পদ দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলব।"

উতবা তার কথা শেষ করার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবুল ওয়ালিদ, তুমি কি শেষ করেছ?" উতবা বললেন, "হ্যাঁ।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে, এখন আমার কথা শোনো।"

তিনি সুরা ফুসসিলাত থেকে কিছু আয়াত পড়লেন। উতবা শান্তভাবে শুনছিলেন। নবি ﷺ সিজদার আয়াত পর্যন্ত এসে সিজদা দিলেন। এরপর বললেন, "তুমি যা শোনার তা শুনেছ। এখন যা ইচ্ছে হয় করো।"

উতবা তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন। তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, যেই চেহারা নিয়ে গিয়েছিল এখন তো সেই চেহারা নেই।" তিনি বসে স্থির হওয়ার পর তারা জিজ্ঞেস করল, "হে আবুল ওয়ালিদ! কী ঘটল?"

উতবা বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি এমন কথা শুনলাম, যা এর আগে কখনো শুনিনি। এটা কবিতা নয়, জাদু নয়, এবং কোনো গণকের কথাও নয়। হে কুরাইশ! আমার কথা শোনো। আমার পরামর্শ হলো, এই মানুষটিকে তার মতো কাজ করতে দাও। তাকে একা ছেড়ে দাও।"

তারা বলল, "আল্লাহর শপথ, তুমি নিশ্চয়ই তার ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছো।" উতবা বললেন, "এটা আমার মতামত। এখন তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো।"

হাবশায় মুসলমানদের হিজরত:

যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের ওপর চলা নির্যাতন প্রত্যক্ষ করলেন। তাদের রক্ষা করার জন্য যেহেতু কিছু করা যাচ্ছে না, তাই তিনি বললেন, "তোমরা যদি হাবশায় চলে যেতে, তবে ভালো হতো। সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছেন, যাঁর শাসনে কারও প্রতি কোনো অবিচার হয় না। হাবশা সত্যের ভূমি। সেখানে আল্লাহ তোমাদের মুক্তির পথ তৈরি করবেন।"

সাহাবিদের এক দল হাবশার দিকে রওনা হলেন। এটা ছিল ইসলামের পূরথম হিজরত। দশজন পুরুষ এবং চারজন নারী এই দলে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উসমান বিন আফফান এবং রাসুলুল্লাহর কন্যা রুকাইয়া। এই দলের আমির ছিলেন উসমান বিন মাজউন। এরপর জাফর ইবনু আবি তালিব এবং অন্যান্য মুসলিমরাও হাবশার পথে যাত্রা করলেন। এভাবে একে একে মুসলিমরা

হাবশায় একত্রিত হলেন। কেউ পরিবার-সমেত, কেউবা একাই হিজরত করলেন। হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় তিরাশিজন মুসলিম। হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্য কুরাইশদের নির্যাতন থেকে মুক্তি ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ইসলামি দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্য, যা নবি ﷺ-এর অন্তরে সান্ত্বনা বয়ে এনেছিল।

হিজরতকারীদের তালিকা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এর মধ্যে মক্কার বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। এতে ধনী-গরিব, প্রবীণ-তরুণ, নারী-পুরুষ সবাই ছিলেন। বেশির ভাগই ছিল মক্কার সম্মানিত পরিবারের সদস্য। এটি ইসলামের দাওয়াতের গভীর প্রভাব ও বিস্তারের শক্তিকে প্রমাণ করে।

কুরাইশদের পিছু ধাওয়া:

কুরাইশ দেখল হিজরতকারীরা হাবশায় শান্তিতে জীবনযাপন করছেন। তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনু আবি রবীআ এবং আমর ইবনু আসকে সেখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। তাদের সঙ্গে হাবশার বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদদের জন্য দামী উপহার পাঠানো হলো। তারা হাবশায় পৌঁছালো এবং উপহারের মাধ্যমে দরবারের লোকদের খুশি করল।

এরপর তারা বাদশাহের দরবারে হাজির হয়ে বলল, "আমাদের কিছু ছোড়রা এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তারা নিজেদের জাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করা থেকেও দূরে থেকেছে। তারা এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে—যা আমাদেরও অজানা

এবং আপনাদেরও। তাদের অভিভাবকেরা তাদের ফিরিয়ে নিতে চায়। আমরা তাদের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। তাদের স্বজনরাই তাদের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত।"
বাদশাহর পাশে বসা দরবারিরা বলল, "হে বাদশাহ, কথা সত্য। তাদেরকে এদের হাতে তুলে দিন।" এ কথা শুনে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি আমার দেশে আশ্রয় নেওয়াকাউকেই এভাবে তুলে দেব না।" তিনি আল্লাহর কসম করে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। নিজের ধর্মীয় নেতাদেরও আহ্বান জানালেন।
মুসলিমদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা যে ধর্মের জন্য নিজ জাতিকে ছেড়ে দিয়েছ, তা কী? কেন আমার ধর্ম বা অন্য কোনো ধর্ম কবুল করোনি?"

জাফর ইবনু আবি তালিব তখন জাহিলি যুগের চিত্র তুলে ধরলেন এবং ইসলামের পরিচয় প্রদান করলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন:
"মহারাজ! আমরা অজ্ঞতা ও অন্ধকারে ডুবে থাকা জাতি ছিলাম। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, নানান অপকর্মে লিপ্ত হতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায়-অবিচার করতাম। আমাদের মধ্যে সবলরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত। এভাবেই আমাদের জীবন কাটছিল। এমন সময় আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশমর্যাদা, সততা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম।
তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন, তাঁকে এককভাবে উপাসনা করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব মূর্তিকে পূজা করত, তা পরিত্যাগ করতে বললেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দিলেন। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ এবং সতী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ থেকে আমাদের বিরত থাকতে বললেন। আমাদেরকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর অংশীদার না করতে বললেন। নামাজ, যাকাত ও রোজার আদেশ দিলেন। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছি, তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে আনা বার্তা মেনে চলেছি। আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না। যা হারাম, তা বর্জন করে চলি; যা হালাল, তা গ্রহণ করি।

কিন্তু আমাদের জাতি আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। তারা আমাদের নির্যাতন করেছে। এই দ্বীন থেকে আবার মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আমাদের পুরনো অপকর্মে জড়াতে বাধ্য করতে চেয়েছে। তারা আমাদের ওপর চরম জুলুম করেছে, আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এবং ধর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তখন আমরা আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আমরা আপনাকেই বেছে নিয়েছি এবং আপনার থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাশা করেছি। হে মহারাজ! আমরা আশা করি, আপনার দেশে আমাদের ওপর কোনো অন্যায় হবে না।"

নাজাসি ধৈর্য-সহকারে সমস্ত কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের রাসুল আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু কি তোমাদের কাছে আছে?"

জাফর ؓ বললেন, "জী, আছে।"

নাজাসি বললেন, "আমাকে তা পড়ে শোনাও।" জাফর ؓ তখন সুরা মারইয়ামের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

তিলাওয়াত শুনে নাজাশির চোখে পানি এসে গেল। তাঁর সাথে থাকা যাজক ও ধর্মীয় ভিজে গেল। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত যাজকরাও কেঁদে ফেললেন।

জাফর ইবনু আবি তালিব ؓ-এর বক্তব্য ও ইসলামকে তুলে ধরার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিবীপ্ত। তিনি সময়োপযোগী কথা বলেছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও বোধশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। এটি ছিল তাঁর স্বভাবের বিশুদ্ধতা

এবং গভীর উপলব্ধির পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে বনু হাশিম গোত্রের লোকেরা অন্যান্য কুরাইশদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। আর কুরাইশরা এ বিষয়ে পুরো আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। জাফর ইবনু আবি তালিবের ওপর এটি ছিল ইলহাম—যা ইসলামকে সমর্থন দিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল। যাতে আল্লাহর নূর ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল ধর্মের ওপরে তা বিজয়ী হয়।

জাফর ؓ তাঁর বক্তব্যে আরবের জাহিলি যুগের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে আল্লাহর রাসুল ﷺ আসার পর তাদের জীবন বদলে গিয়েছিল। আর তাঁরা আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছিলেন। সরল দ্বীন এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন। নবিজির প্রতি ঈমান এনে তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন। এভাবে বাস্তবচিত্র তুলে ধরে বিতর্ক এড়ানোর মাধ্যমে শ্রোতার মনে সহজে প্রভাব বিস্তার করা

যায়, যা লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। এতে সুচিন্তা, ন্যায়বিচার এবং আন্তরিকতার ছবি স্পষ্ট হয়।

সব কথা শুনে নাজাশী বলেন, "এটি এবং যা ঈসা নিয়ে এসেছেন—তা একই উৎস থেকে এসেছে।" এরপর তিনি কুরাইশ-দূতদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না।"

আমর ইবনু আস পরদিন তাঁর শেষ তীরটি ব্যবহার করলেন—যা ছিল বিষাক্ত ছোবলের মতো। তিনি নাজাশির দরবারে গিয়ে বললেন, "হে মহারাজ! তাঁরা ঈসা ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে অত্যন্ত গর্হিত কথা বলে।"

নাজাশী তখন মুসলিমদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা ঈসা ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে কী কী বলো?"

জাফর ইবনু আবি তালিব উত্তর দিলেন, "আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের নবি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি এক আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসুল, তাঁর রুহ এবং তাঁর কালিমা। তিনি সতিসাধ্বী নারী মারইয়ামের গর্ভে প্রেরিত হয়েছিলেন।"

নাজাশী মাটিতে হাত দিয়ে একটি কাঠি তুলে নিয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! যা তুমি বলেছ, ঈসা ইবনু মারইয়াম এর চেয়ে চুল পরিমাণও বেশি কিছু নন।" এরপর তিনি মুসলিমদের মর্যাদাসহকারে থাকতে দিলেন। তাঁদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কুরাইশের দূতদের উপহার ফিরিয়ে দিলেন।

উমরের ইসলাম গ্রহণ :

আল্লাহ তায়ালা ইসলামের শক্তি ও মুসলিমদের সাহস বৃদ্ধি করেছিলেন উমরের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন শক্তিশালী, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং অত্যন্ত মর্যাদাবান।

রাসূলুল্লাহ তাঁর জন্য উমরীয় ছিলেন। আল্লাহর কাছে তাঁর হেদায়েতের জন্য অনবরত দোয়া করেছিলেন। উমরের বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনু যায়দান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উমরের কঠোর মনোাভাবের কারণে তাঁরা তা গোপন রেখেছিলেন। খাব্বাব ইবনু আরত নিয়মিত এই দুইজনকে কোরআন শেখাতেন। একদিন উমর তলোয়ার হাতে বের হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর কিছু সাহাবিকে খুঁজে বের করা। খবর ছিল যে তাঁরা সাফা পাহাড়ের কাছে এক ঘরে মিলিত হয়েছেন। পথিমধ্যে তিনি নুয়াইম ইবনু আবদুল্লাহর মুখোমুখি হলেন, যিনি ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নুয়াইম জিজ্ঞেস

করলেন, "উমর! কোথায় যাচ্ছেন?"

উমর বললেন, "আমি সেই মুহাম্মাদকে খুঁজতে বেরিয়েছি, যে কুরাইশদের ঐক্য বিনষ্ট করেছে, তাদের প্রজ্ঞা নিয়ে উপহাস করেছে, তাদের ধর্মের সমালোচনা করেছে এবং তাদের দেবতাদের অপমান করেছে। আমি তাঁকে হত্যা করব।"

নুয়াইম বললেন, "উমর! আপনি ভুল করছেন। আগে নিজ ঘরের খবর নিন।"

উমর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরে কী হয়েছে?"

নুয়াইম বললেন, "আপনার বোন এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছেন। আগে তাঁদের খবর নিন।"

উমর তখন তাঁর ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁদের কাছে ছিলেন খাব্বাব ইবনু আরত। তাঁর কাছে ছিল কোরআনের একটি অংশ—যাতে সূরা ত্বহা লেখা ছিল। তিনি ফাতিমা ও তাঁর স্বামীকে তিলাওয়াত শেখাচ্ছিলেন। উমর-এর পায়ের শব্দ শুনে খাব্বাব দ্রুত লুকিয়ে গেলেন। ফাতিমা কাগজটি তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। উমর দরজার কাছে এসে খাব্বাবের কণ্ঠ শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "ফিসফিসানি কিসের?"

তাঁরা বললেন, "আপনি বোধয় ভুল শুনেছেন।"

উমর রাগত স্বরে বললেন, "আমি জানি, তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম অনুসরণ করা শুরু করেছ।" এই বলে উমর তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদকে চেপে ধরলেন। বোন ফাতিমা তাঁর স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে গেলেন। উমর তাঁকেও আঘাত করলেন। এতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল।

ফাতিমা ও সাঈদ তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন তুমি যা খুশি করতে পারো!"

বোনের রক্ত দেখে অনুতপ্ত হলেন উমর। শান্ত স্বরে বললেন, "ওই কাগজটা আমাকে দাও তো, যে অংশ তোমরা পড়ছিলে। আমি তা দেখতে চাই।"

ফাতিমা বললেন, "আপনার ব্যাপারে আমরা শঙ্কিত।" উমর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "ভয় কোরো না।"

ফাতিমা তাঁর মধ্যে ইসলামের আশা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "ভাই, আপনি এখনো মূর্তিপূজক; এই কাগজ স্পর্শ করতে হলে পবিত্র হতে হবে।"

উমর তখন উঠে গিয়ে গোসল করলেন। এরপর ফাতিমা তাঁকে কাগজটি দিলেন, যাতে সূরা ত্বহা ছিল। কিছু অংশ পড়ার পর উমর বললেন,

“কী সুন্দর এবং মহিমান্বিত বাণী!”

উমরের ইসলামের কাহিনী সত্যিই এক অপূর্ব ও হৃদয়গ্রাহী। যখন খাব্বাব ইবনু আরত উমরের এই কথা শুনলেন, তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন,

“হে উমর! আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নবির দুআর জন্যই বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন। গতকাল আমি নবিজি-কে বলতে শুনেছি—‘হে আল্লাহ! আবু হাকাম ইবনু হিশাম (আবু জাহল) বা উমর ইবনু খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করো।’ আল্লাহর কসম, আমি আশা করছি তুমি সেই ব্যক্তি হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করবেন।” [৬৭]

এটা শুনে উমর বললেন, “হে খাব্বাব, আমাকে নিয়ে চলো। মুহাম্মাদ -এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করব।”

খাব্বাব তখন তাঁকে সাফা পাহাড়ের কাছে অবস্থিত একটি ঘরের সন্ধান দিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর সাথিদের সাথে সেখানেই ছিলেন। উমর তখন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় তলোয়ার কোমরে বাঁধলেন। এরপর রওনা হলেন রাসূলুল্লাহ -এর দিকে।

তিনি গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। তাঁর শব্দ শুনে এক সাহাবি ভয়ে তাড়াহুড়ো করে নবিজির কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! উমর ইবনু খাত্তাব এসেছে, কোমরে তাঁর তলোয়ার বাঁধা!” হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব তখন বললেন, “তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে আসে, আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবো। কিন্তু যদি কোনো ক্ষতি করতে আসে, আমরা তলোয়ার দিয়ে তাকে প্রতিহত করব।”

নবিজি বললেন, “তাকে আসতে দাও।”

তখন সাহাবি দরজা খুলে দিলেন। নবিজি উঠে দাঁড়িয়ে উমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পোশাক ধরে তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে বললেন, “ওহে খাত্তাবের পুত্র! তুমি এখানে কেন এসেছ? আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার ওপর বড় ধরনের কোনো শাস্তি পাঠানোর আগ পর্যন্ত থামবে না বুঝি!”

এটি শুনে উমর গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এসেছি আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে। আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি আল্লাহর রাসূল।”

নবি তাঁর এ কথাগুলো শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁর মুখে এক চিরন্তন হাসি ফুটে উঠল। তাঁর স্নেহময় দৃষ্টি উমরের হৃদয়কে আলোড়িত করল। নবি তকবির উচ্চারণ করলেন। তাঁর তকবির শোনার পর সাথিরা বুঝে গেলেন, উমর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
উমরের মাথা থেকে যেন ভারী বোঝা নেমে গেল। এক নতুন বিশ্বাস ও ভালোবাসার ভিত্তিতে নবিজির সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হলো।

তায়েফে গমন ও সেখানকার নির্যাতন:
আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবি-এর ওপর তীব্র অত্যাচার শুরু করল। আগে তাদের এত সাহস হয়নি। একদিন এক মূর্খ এসে রাসূলুল্লাহ-এর মাথায় ধূলি ছুঁড়ে দিল।
কুরাইশদের অত্যাচার যখন তীব্র হয়ে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ তায়েফের দিকে রওনা হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সেখানকার বনু সাকিফ গোত্র তাকে সমর্থন দিবে এবং ইসলাম কবুল করবে। রাসূলুল্লাহ-এর মনে তায়েফবাসীর প্রতি সুধারণা ছিল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ নবি কারীম ছোটবেলায় বনু সাদ গোত্রে দুধ পান করেছিলেন এবং সেখানকার নারীরা তাকে লালনপালন করেছিল।
তায়েফ শহরটি মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এটি জাবালে গাজওয়ান নামক পর্বতের ওপর অবস্থিত, যার উচ্চতা প্রায় ছয় হাজার ফুট। মক্কা ও মদীনার পর মক্কার তৃতীয় বৃহৎ শহর হলো তায়েফ। যেখানে রাসূলুল্লাহ গিয়েছিলেন। এই সফর ব্যক্তিগত নয়; বরং নবুয়ত ও দাওয়াতের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি দু'বার তায়েফ গিয়েছিলেন—প্রথমবার শাওয়াল মাসে, নবুয়াতের দশম বছরে। দ্বিতীয়বার হিজরতের অষ্টম বছরে।
তায়েফ নামটি এসেছে শহরটিকে ঘিরে থাকা প্রাচীর থেকে। যার কারণে এটি "ঘেরা শহর" নামে পরিচিত। তায়েফের প্রাচীন নাম ছিল "ওয়াজ।" কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তায়েফে অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। গ্রীষ্মকালে সেখানেই সময় কাটাত। আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবেরও সেখানে জমিজমা ছিল। বালাজুরী বলেন, "অধিকাংশ কুরাইশদেরই তায়েফে জমি ছিল, তারা মক্কা থেকে এসে সেগুলো দেখভাল করত।"
তায়েফের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছিল। ধনীরা সুদ, ব্যভিচার ও মদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখানে ছিল মদ, কিশমিশ, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং

সুগন্ধির কারখানা। পর্যাপ্ত পানি, উর্বর মাটি ও বিভিন্ন ফসলের কারণে তায়েফে চাষাবাদ ও বাগানের সংখ্যা ছিল উল্লেখ করার মতো। এই অঞ্চলটি এখনো ফলমূলের জন্য বিখ্যাত। তায়েফ ছিল অবকাশযাপনের স্থান যা ইসলামি যুগেও অব্যাহত ছিল। উমাইয়া যুগের কবি উমর ইবনু আবি রাবিয়া বলেন: "শীত মক্কায় কাটে সুখে, আর গ্রীষ্ম কাটে তায়েফে।"

তায়েফবাসীরা ছিল ধনী। তাদের ছিল সম্পদের প্রাচুর্য ও বাগ-বাগিচা। এই সমৃদ্ধি তাদের মধ্যে অহংকার এবং আত্মগরিমার জন্ম দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ (৩৪) وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (৩৫)

"আর আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই সেখানকার বিত্তবান অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ অবশ্যই আমরা তা প্রত্যাখ্যানকারী'। তারা আরো বলেছে, 'আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব না'।"

সাকিফ গোত্রের লোকেরা ছিল তায়েফের শীর্ষ শ্রেণি। তারা বেশ শক্তিশালী এবং ধনী। তায়েফ এবং কুরাইশের মধ্যে ছিল ধর্মীয় প্রতিযোগিতা। তারা তাদের মূর্তি 'লাত'-কে কাবার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। একে ঘিরে একটি পবিত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটি কাবার মতোই তাদের কাছে সম্মানিত ছিল।

আবরাহা যখন মক্কায় অভিযান পরিচালনা করল, তখন একমাত্র তায়েফবাসীরাই তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। মক্কা যাওয়ার পথ নির্দেশের জন্য আবু রিগাল নামেএকজন লোককেও পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে এই ব্যক্তি পথিমধ্যেই মারা যায়। আরবের লোকেরা তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। তার কবর পাথর দিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।

সাকিফ গোত্রের লোকেরা আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করত। তারা উমাইয়া পরিবারের সাথে জোটবদ্ধ ছিল। অর্থ ও খ্যাতির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল। তারা বাণিজ্য ও সম্পদ আহরণে একযোগে কাজ করত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "কুরাইশ এবং আনসারগণ একে অপরের সহচর। আর উমাইয়া পরিবার ও সাকিফ গোত্র একে অপরের সহচর।"

সাকিফ গোত্রের নেতা ছিলেন উরওয়া ইবনু মাসউদ। তাঁর স্ত্রীর নাম আমেনা বিনতে আবি সুফিয়ান। দাউদ নামে তাঁর এক সন্তান ছিল। সাকিফ গোত্রে আরও বিখ্যাত ছিলেন হারিস ইবনু কুলদা, যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি পারস্যে গিয়ে ডাক্তারি শিখে এসেছিলেন। আরবদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল বেশ। তাঁর ছেলে নাযর ইবনু হারিস রাসূলুল্লাহ-এর চাচাতো ভাই ছিলেন।

তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও দর্শন শিখেছিলেন। তবে তিনি নবি-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং তাঁকে অবজ্ঞা করতেন।

সাকিফ গোত্রের উমাইয়া ইবনু আবি সালত ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি। তিনি জাহিলি এবং ইসলাম—উভয় যুগেই হায়াত পেয়েছেন। তিনি প্রাচীন কিতাবাদি, বিশেষ করে তওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন। ছিলেন হানিফদের মধ্যে অন্যতম। যখন রাসূলুল্লাহ-এর নবুওয়াত প্রকাশিত হয়, তখন ঈর্ষার কারণে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি নবি-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিতেন। তাঁর অনেক কবিতায় একত্ববাদ ও প্রজ্ঞা ছিল। রাসূলুল্লাহ একবার বলেছিলেন: "তার কবিতা ঈমানদীপ্ত, কিন্তু তার হৃদয় কুফরিতে পরিপূর্ণ।"

নবি-এর মৃত্যুর পর যখন অনেক নওমুসলিম ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিল, কুরাইশ এবং সাকিফ গোত্র তখন অটল ছিল। ইমাম ইবনু কাসির বলেছেন: "সাকিফ গোত্র তায়েফে অবিচল ছিল। তারা মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।" তারা জিহাদ ও অন্যান্য সাহসী কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের সাহসিকতা ছিল প্রশংসিত।

রাসূলুল্লাহ তায়েফ গিয়েছিলেন, কারণ মক্কার পরে দ্বিতীয় শক্তিধর কেন্দ্র ছিল এটি। ভিন্ন কারণও রয়েছে। তাঁর মায়ের গোত্র সাকিফের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে সমর্থন ও নিরাপত্তা পাওয়ার আশায়।

নবি ছিলেন মক্কার বাসিন্দা। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, মক্কা ও তায়েফের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। উভয় এলাকার জনগণের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত হতো। তিনি জানতেন, মক্কা থেকে তাঁর প্রতি অবিশ্বাস এবং আঘাতের খবর তায়েফে এসে পৌঁছেছে। তবুও, তিনি এই দীর্ঘ যাত্রা করেছিলেন শুধু ইসলাম প্রচারের জন্য। যাতে তাঁর বার্তা তায়েফে বিস্তার লাভ করে। এর মাধ্যমে তাঁর দৃঢ় মনোবল এবং আল্লাহর প্রতি অটুট আস্থা প্রকাশিত হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা ও সঠিক পথ অনুসরণ করার ক্ষমতা।

নবি শাওয়াল মাসে, নবুয়াতের দশম বছরে তায়েফ গিয়েছিলেন। ইবনু সাদ, ইবনুল আসির এবং অন্যান্য ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, এই যাত্রায় তাঁর সাহাবি যায়দ ইবনু হারিসা সঙ্গে ছিলেন।

মক্কার পরেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তায়েফ। এখানে ছিল ব্যাপক জনবসতি এবং আর্থিক সমৃদ্ধি। এ শহর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বে ছিল মক্কার সমতুল্য। তায়েফ ছিল লাত

দেবতার পবিত্র স্থান। এটিকে কেন্দ্র করে পূজা-অর্চনা হতো এবং সেখানে হজও করা হতো। মক্কায় যেমন 'হুবাল' ছিল প্রধান দেবতা, তায়েফেও এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'লাত'। রাসূলুল্লাহ তায়েফে পৌঁছে সাকিফ গোত্রের প্রধানদের কাছে গেলেন। তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানালেন। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। তারা হাসি-ঠাট্টা শুরু করল নবিজিকে নিয়ে। তাদের দাস ও শিশুদের লেলিয়ে দিল রাসূল-কে অপমান করার জন্য। তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে লাগল।

তায়েফ তাকে যে আঘাত করল, তা ছিল মক্কার সকল আঘাতের চেয়েও দুর্বিষহ। তায়েফের লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল পথের দুই পাশে। তিনি যখন হেঁটে চলছিলেন, তখন তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। যার ফলে রাসূল-এর পা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল।

তীব্র তাঁর কষ্ট নিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমার দুর্বলতা, কৌশলের ঘাটতি ও মানুষের কাছে অপমানের অভিযোগ করছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু, আপনি দুর্ভাগাগ্রস্তের প্রভু ও আমার প্রভু। আমাকে কার কাছে সোপর্দ করবেন? কোনো দূরের লোক যে ভ্রু কুঞ্চিত করবে? নাকি কোনো শত্রুকে আমার শাসক বানিয়ে দেবেন? যদি আপনি আমার ওপর রাগান্বিত না থাকেন, তবে আমি পরোয়া করি না। তবে আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য বেশি প্রশস্ত।"

চেহারার নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যা সকল অন্ধকারকে আলোকিত করেছে এবং তারই ভিত্তিতে দুনিয়া-আখিরাতের ব্যবস্থাপনা সুবিন্যস্ত হয়েছে—যেন আপনি আমার ওপর রাগান্বিত না হন, আমাকে আপনার ক্রোধ স্পর্শ না করে। সর্বতোভাবে আমি আপনার সন্তুষ্টিই কামনা করি। আপনি ব্যতীত কারও কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই।"

এ সময় আল্লাহ তাআলা তায়িফের পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে পাঠান। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া ছিল, নবিজি চাইলে সে যেন তায়িফের দুই পাহাড়কে মিলিয়ে ফেলে। উদ্দেশ্য ছিল, তায়িফবাসীদেরকে পিষে মেরে ফেলা। তবে দয়ার নবি ﷺ এই কাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "কিন্তু আমি চাই তাদের বংশ থেকে আল্লাহ এমন কাউকে বের করুন যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না

উতবা ও শায়িবা রাসূল ﷺ-এর কাছে আদ্দাস নামী তাদের এক গোলামকে দিয়ে এক থোকা আঙুর পাঠাল। আদ্দাস নির্দেশ মতো সেই কাজটি করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলাপ করে তাঁর মহানুভব চরিত্র দেখে মুসলমান হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়িফ থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর সম্প্রদায় তখনো তাঁর বিরোধিতা, শত্রুতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং যন্ত্রণা দেওয়ার কাজ অব্যাহত রেখেছিল।

ইসরা ও মিরাজ

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতে মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে যান।সেখান থেকে তিনি আসমানে ওঠেন। বিভিন্ন আসমান ভ্রমণ করেন। আল্লাহর মহিমা ও অগণিত নিদর্শন দেখেন। অনেক নবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

তার দৃষ্টি এদিক-সেদিক যায়নি এবং সীমাও অতিক্রম করেনি। নিশ্চয় সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ থেকে দেখেছে।"

এটি ছিল আল্লাহর তরফ থেকে নবিজির জন্য এক ধরনের সান্ত্বনা। তায়েফে যেসব কষ্ট তিনি ভোগ করেছেন, তার পরিপূরক। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

আবু বকর **رضي الله عنه**-কে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলেন, "যদি রাসূল ﷺ বলে থাকেন তাহলে সত্যিই বলেছেন। আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আল্লাহর কসম, তিনি আমাদেরকে বলেন যে, রাত-দিনের যে কোনো সময়ে আসমান থেকে জমিনে তাঁর নিকট সংবাদ আসে। আপনারা যা নিয়ে অবাক হচ্ছেন তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক সেটিই।"

মিরাজের সূক্ষ্ম তাৎপর্য:

মিরাজ শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺকে তাঁর অসীম নিদর্শন দেখি পাশাপাশি আসমান ও জমিনের রাজত্বকে খোলাখুলি তাঁর সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই আধ্যাত্মিক সফরে অনেক সূক্ষ্ম দিক ছিল। এই সফরেই বিভিন্ন মর্মপূর্ণ ইশারা এবং আল্লাহর পরিকল্পনা বোঝানো হয়েছি সূরা ইসরা এবং সূরা নাজম মিরাজের ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদুল-হারাম ও মসজিদুল-আকসার নবি। উভয় দিক অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমের ইমাম। তিনি ছিলেন সকল নব-**عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ**-এর উত্তরাধিকারী এবং সমস্ত উম্মতের পথপ্রদর্শক।

মিরাজের সফরে মসজিদুল-হারাম এবং মসজিদুল আকসার মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে দেখা গেছে যে, সমস্ত আম্বিয়া **عَلَيْهِ ٱلسَّلَام** নবিজির ইমামতিতে

একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করেছেন। এটা তাঁর নেতৃত্বের স্থায়িত্ব এবং তাঁর দাওয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করেছে। এই ঘটনা ছিল তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাঁর ইমামত ও নেতৃত্বের সত্যতা এবং উম্মাহর প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণের মুহূর্ত। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের সত্যকারের ঘোষণা। তাঁর ঐশী দাওয়াতের বাস্তবতা এবং তাঁর সার্বজনীন নেতৃত্বের প্রমাণ।

মিরাজের মাধ্যমে নবুওয়াতের বিশ্বজনীন মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে ওঠে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল কোনো জাতীয় নেতা, স্থানীয় পথপ্রদর্শক, অথবা কোনো কওমের নেতা হতেন, তবে তাঁর জন্য আসমানি মিরাজের প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিচরণ করারও প্রয়োজন ছিল না।

যদি কেউ শুধুমাত্র নিজের সমাজ, অর্থবিত্ত এবং ব্যক্তিগত সুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে অন্যদের ভাবনা তাকে স্পর্শ করে না। তার চিন্তা আসমান বা পৃথিবীর অন্য কোথাও পৌঁছায় না।

মসজিদুল-আকসা নবিজির শহর থেকে অনেক দূরে। সেখানে ছিল খ্রিষ্টানদের শাসন এবং শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য। তাই ইসরা এবং মিরাজের ঘটনাটি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এটি প্রকাশ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল একটি নির্দিষ্ট জাতি বা সমাজের নেতা নন। তাঁর কাজ, দক্ষতা, এবং সংগ্রামের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আসলে একজন মহান নবি—যিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে আল্লাহর বার্তা নিয়ে এসেছেন। তাঁর বার্তা কেবল নিজের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পৃথিবীর সকল জাতি, সমাজ, সময় ও প্রজন্মের জন্য। তিনি গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জাতি-শ্রেণি-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হবে।

মিরাজের সময় আল্লাহ তাঁর নবির উম্মতের ওপর প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদন করছিলেন। আল্লাহর কাছে অনুরোধ করছিলেন বারবার। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সালাতের সংখ্যা পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেন। তবে, যে ব্যক্তি ইমান ও নেক উদ্দেশ্য সহকারে এই পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করবে, তার জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব থাকবে।

বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচার:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে যান। ইসলামের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বলেন, "ওহে অমুক গোত্র! আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি— আপনারা তাওহিদ স্বীকার করে নিন। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করেন, তাদের পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিতে এসেছি। আমি চাই—

আপনারা আমাকে নিরাপত্তা দিন, যেন আমি নির্ভয়ে আল্লাহর কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কথা শেষ করতেন, তখন আবু লাহাব উঠে প্রতিবাদ জানাত। সে বলত, "ওহে অমুক গোত্র! এই লোকটি আপনাদেরকে বলছে যে, আপনারা আপনাদের জীবন থেকে 'লাত' এবং 'উজ্জা' নামক মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলুন। তাদের সাথে সম্পর্কিত জিনদের ইবাদত বাদ দিন। সে আসলে একটি নতুন ধর্মের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তার কথা শুনবেন না, তাকে অনুসরণও করবেন না।"

এভাবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করত এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত।

ইসলামের পথ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ ছিল বিপদে পরিপূর্ণ। সত্যাসন্ধানী ব্যক্তিরা যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইত, তাহলে তাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়ে যেত। এটি স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় আবু যার গিফারী **رضي الله عنه**-এর ঘটনা থেকে। তিনি মক্কায় আসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করতে। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। ইবনে আব্বাস **رضي الله عنه**-এর বর্ণনায় এসেছে, 'নবি ﷺ-এর রিসালাতের সংবাদ আবু যার **رضي الله عنه** এর নিকট পৌঁছলে, তিনি তাঁর ভাইকে বলেন,

"মক্কায় গিয়ে আমার জন্য এই ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো, যিনি নিজেকে নবি দাবি করছেন এবং যার নিকট আসমান থেকে সংবাদ আসে।"

তার ভাই এসে নবি

-ﷺএর কথা শুনে, এবং আবু যারের নিকট ফিরে গিয়ে বল—

“আমি দেখলাম, তিনি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, আর এমন কথা বলছেন যা কবিতা নয়।” তিনি বলেন, আমি যে জন্য তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে না।’

আবু যার **رضي الله عنه** সফরের জন্য সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট্ট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবি ﷺ-কে খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি তাঁ চিনতেন না। আবার কাউকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাও পছন্দ করলেন না। এ অবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি শুয়ে পড়লেন। আল **رضي الله عنه** ীতাঁকে দেখে বুঝলেন যে, লোকটি বিদেশী। যখন আবু যার ‘আল-**رضي الله عنه** ীকে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবু যার **رضي الله عنه** পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নব ﷺ িতাঁকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন ‘আল **رضي الله عنه** ীতাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি বললেন, এখনো কি মুসাফিরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান হয়নি? সে এখনো এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ অবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। ‘আলী **رضي الله عنه** পূর্বের ন্যয় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে বলবে না কোন জিনিস এখানে আসতে তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে?

আবু যার **رضي الله عنه** বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক রাস্তা দেখানোর পাকা অঙ্গীকার করো, তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী **رضي الله عنه** অঙ্গীকার করলেন এবং আবু যারও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বললেন। তিনি বলেন, ‘এটিই সত্য; আর তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সকালে আপনি আমার পিছনে পিছনে আসবেন। আপনার জন্য কোনো বিপদ দেখলে, আমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে যাবো, যেন জলবিয়োগ করতে যাচ্ছি। আর আমি যদি চলতে থাকি, তাহলে আমার পিছনে পিছনে আসবেন এবং আমি যেখানে ঢুকবো, আপনিও সেখানে ঢুকে পড়বেন।’

আলি তাই করলেন; আর আবু যারও তার পিছু নিয়ে শেষতক নবি ﷺ-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর কথা শুনে তিনি সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবি ﷺ তাকে বললেন, "নিজ জাতির কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে (আমার ব্যাপারে) অবহিত করো। (সেখানে অবস্থান করো) যতক্ষণ না তোমার নিকট আমার নির্দেশ পৌঁছবে।"

তিনি বললেন, 'শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশদের সামনে আমি সজোরে আমার ইমানের ঘোষণা দেবো।' অতঃপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে মাসজিদে এসে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা দেন, '(তৎক্ষণাৎ) লোকেরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মারতে মারতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমনসময় আব্বাস **رضي الله عنه** এসে তাঁকে রক্ষা করলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবারিত। তোমরা কি জান না, এ লোকটি গিফার গোত্রের? তোমাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। এ কথা বলে তিনি তাদের হাত হতে আবু যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন সকালে তিনি এরূপই বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ভীষণভাবে মারতে লাগল। আব্বাস **رضي الله عنه** এসে তাঁকে সামলে নিলেন।

মদিনার দিকে হিজরত:

১. আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা:

মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত বাধা ও অত্যাচারের মুখে নবিজি ﷺ আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হজে আসা মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। নবুয়তের ১১তম বছরে মদিনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) খাযরাজ গোত্রের ছয়জন লোক নবিজি ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মদিনায় গিয়ে ইসলামের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন।

- আকাবাব প্রথম বাইয়াত: নবুয়তের ১২তম বছরে হজের মৌসুমে মদিনার ১২ জন প্রতিনিধি মক্কার অদূরে 'আকাবা' নামক স্থানে নবিজি ﷺ-এর কাছে কিছু শর্তে শপথ করেন। তারা শিরক না করা, চুরি বা ব্যভিচার না করা এবং নবিজি ﷺ-এর নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। একে 'বায়াতুল আকাবা উলা' বলা হয়।
- আনসারদের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তুতির কারণ: মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্র দুটি দীর্ঘকাল ধরে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা একজন নেতার প্রয়োজন অনুভব করছিল যিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ করবেন। এছাড়া মদিনায় বসবাসরত

ইহুদিদের কাছ থেকে তারা একজন নবির আগমনের কথা আগে থেকেই জানত, যা তাদের ইসলাম গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত রেখেছিল।

- মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত: মদিনা হলো ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। নবিজি ﷺ এই শহরের বরকতের জন্য দোয়া করেছেন। হিজরতের পর এটি 'মদিনাতুন নবী' বা নবির শহর হিসেবে পরিচিতি পায় এবং ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হিসেবে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
- মদীনায় ইসলামের প্রসার: প্রথম বাইয়াতের পর নবিজি ﷺ মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে শিক্ষক হিসেবে মদিনায় পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টায় মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং মদিনার অনেক প্রভাবশালী নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন।
- আকাবাব দ্বিতীয় বাইয়াত: নবুয়তের ১৩তম বছরে মদিনার ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী নবিজি ﷺ-এর সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে ইসলাম ও নবিজিকে সর্বাত্মক রক্ষার শপথ নেন। এটিই মদিনায় হিজরতের পথ প্রশস্ত করে।

২. সাহাবিদের মদীনায় হিজরত:

আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর নবিজি ﷺ সাহাবিদের মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। সাহাবিরা একে একে তাদের সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কুরাইশরা বাধা দিলেও ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা মদিনায় পাড়ি জমান।

৩. নবিজির হিজরত:

অবশেষে মহান আল্লাহর নির্দেশে নবিজি ﷺ হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এটি ইসলামের ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

- বিপরীত দৃশ্যপট: একদিকে কুরাইশরা 'দারুন নদওয়া'য় বসে নবিজি ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে নবিজি ﷺ অত্যন্ত শান্তভাবে আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আলীকে (রা.) নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে তিনি কাফেরদের ঘেরাও করা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।
- হিজরত থেকে একটি শিক্ষা: হিজরত শেখায় যে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখার পাশাপাশি যথাযথ পরিকল্পনা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

নবিজি ﷺ অলৌকিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলগুলোও ব্যবহার করেছিলেন।

- গারে সাওর অভিমুখে: মক্কার কাফেরদের বিভ্রান্ত করতে নবিজি ﷺ উল্টো পথ ধরে 'সাওর' পর্বতের গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করেন। আবু বকর (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। কাফেররা গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছালেও আল্লাহর কুদরতে তারা নবিজিকে দেখতে পায়নি।
- ভালোবাসার অপূর্বতা: গারে সাউরে আবু বকর (রা.)-এর ভূমিকা ছিল নজিরবিহীন। তিনি নবিজির নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন এবং গুহার গর্তগুলো নিজের কাপড় ও পা দিয়ে বন্ধ করেছিলেন যাতে নবিজির কোনো ক্ষতি না হয়।
- স্পর্শকাতর মুহূর্ত: যখন কুরাইশরা গুহার দরজায় এসে দাঁড়ালো, আবু বকর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লে নবিজি ﷺ বলেছিলেন, "ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" এই উক্তিটি চিরকালীন ঈমানি শক্তির উৎস।
- বস্তুবাদী মনন যা মেনে নিতে পারে না: লৌকিক যুক্তিতে নবিজি ও আবু বকর (রা.)-এর রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু মুমিনদের কাছে এটি আল্লাহর সরাসরি সাহায্য ও কুদরতের নিদর্শন, যা কেবল পার্থিব চিন্তা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।
- মুবারক ব্যক্তি: হিজরতের পথে নবিজি ﷺ উম্মে মাবাদ নামক এক মহীয়সী নারীর তাঁবুতে বিশ্রাম নেন। সেখানে নবিজির স্পর্শে এক দুর্বল ও দুধহীন ছাগলের ওলান দুধে ভরে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনা ঘটে। উম্মে মাবাদ পরে তাঁর স্বামীর কাছে নবিজির যে শারীরিক ও চারিত্রিক বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের এক অনন্য দলিল।

❁ নবুয়ত থেকে হিজরত পর্যন্ত শিক্ষা:

❁শিক্ষা-০১: যেকোনো মহান মিশনের শুরুতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক মানবিক গুণ। সত্যের পথে চলার জন্য জীবনসঙ্গী বা নিকটজনের মানসিক সমর্থন অত্যন্ত জরুরি। জ্ঞানার্জনই ইসলামের প্রথম ভিত্তি।

শিক্ষা-০২: যেকোনো মহৎ কাজের শুরুতে একটি বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করা প্রয়োজন। প্রতিকূল পরিবেশে কৌশলী হওয়া সফলতার চাবিকাঠি।

শিক্ষা-০৩: সত্য প্রকাশ করলে বিরোধিতা আসবেই। সমাজ সংস্কারের পথে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। সত্যের জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে।

শিক্ষা-০৪: ঈমানের পরীক্ষায় ধৈর্য এবং দৃঢ়তা থাকলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। আদর্শের জন্য কষ্ট স্বীকার করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা-০৫: যোগ্য নেতৃত্বের আগমনে যেকোনো আন্দোলন বেগবান হয়। দ্বীনের বিজয়ের জন্য প্রভাবশালীদের ইসলামের ছায়াতলে আসা অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষা-০৬: সত্যের পথে চলতে গেলে আর্থিক ও সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হতে হতে পারে। প্রতিকূলতায় বিচলিত না হয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখাই সাফল্যের মূল।

শিক্ষা-০৭: দ্বীন বা ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে মাতৃভূমি ত্যাগ করা বৈধ। সাময়িকভাবে নিরাপত্তার জন্য অমুসলিম কিন্তু ন্যায়পরায়ণ শাসকের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা-০৮: আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিপদের পর বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যেন তারা কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করতে শেখে। পার্থিব সাহায্যকারী চলে গেলেও আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

শিক্ষা-০৯: দাঈ বা প্রচারককে চরম ধৈর্যশীল হতে হবে। প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া নববী আদর্শ। প্রতিকূলতায়ও মানুষের মঙ্গলের জন্য দোয়া করতে হবে।

শিক্ষা-১০: এই সফরেই ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়, যা মুমিনের জন্য মিরাজ স্বরূপ। এটি প্রমাণ করে যে, দুঃখের পরই সুখ আসে এবং কষ্টের শেষ সীমানায় আল্লাহর বিশেষ রহমত অপেক্ষা করে।

শিক্ষা-১১: একটি বড় পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। আনসারদের ত্যাগ প্রমাণ করে যে, ইমানি ভ্রাতৃত্ব রক্তের সম্পর্কের চেয়েও শক্তিশালী।

শিক্ষা-১২: বিজয়ের জন্য কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা নয়, বরং সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সত্যকে স্তব্ধ করার সব ষড়যন্ত্র আল্লাহর কুদরত ও হেকমতের সামনে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

টপিক:০৪ - হিজরতের সময়ে মদিনার সমাজচিত্র ।

১/মক্কা ও মদীনার সামাজিক পার্থক্য:
মক্কার সমাজ ছিল একক কুরাইশ বংশের শাসনাধীন এবং মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য ও মূর্তিপূজা কেন্দ্রিক।মদীনার সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত, কৃষিভিত্তিক এবং সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না।মক্কায় ধর্মীয় নেতৃত্ব সুসংহত থাকলেও মদীনায় গোত্রীয় কোন্দলের কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল না।

২/ইহুদিদের অবস্থান ও গোত্রসমূহ:
মদীনায় বনু কাইনুকা, বনু নাযির ও বনু কুরাইজা নামক তিনটি প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র বসবাস করত।তারা মদীনার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাঠামোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত এবং দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করত।নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে তারা আরব গোত্রগুলোর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভেদ ও যুদ্ধ জিইয়ে রাখত।

৩/ইহুদিদের ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক দিক:
ইহুদিরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রবল জাতিগত অহংকার ও নৈতিক স্খলন দেখা দিয়েছিল।তারা আসমানি কিতাবের বিধানের চেয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা ও জাগতিক স্বার্থসিদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য দিত।সুদখোরি, প্রতারণা এবং সাধারণ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা ছিল তাদের চরিত্রের অন্যতম কালো দিক।

৪/আওস ও খাযরাজ গোত্র:
মদীনার প্রধান দুই আরব গোত্র আওস ও খাযরাজ দীর্ঘকাল ধরে রক্তক্ষয়ী বুয়াসের যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ফলে উভয় গোত্রই শারীরিকভাবে ক্লান্ত এবং মানসিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল।তারা এমন একজন যোগ্য ও নিরপেক্ষ নেতার অনুসন্ধান করছিল যিনি তাদের এই শতাব্দী শত্রুতার অবসান ঘটাবেন।

৫/প্রাকৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা
মদীনা ছিল অত্যন্ত উর্বর ও কৃষিপ্রধান এলাকা, যেখানে প্রচুর খেজুর বাগান এবং পানির সুব্যবস্থা ছিল।ধর্মীয়ভাবে সেখানে মূর্তিপূজক আরব এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী

ইহুদিদের এক বিচিত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করা যেত।সামাজিকভাবে সেখানে আইনের শাসন বলতে কিছু ছিল না, যার ফলে নারী ও দুর্বলরা সবসময় শোষিত হতো।

৬/আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা:
মদীনার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর, কিন্তু এর বড় একটি অংশ ইহুদি মহাজনদের উচ্চ সুদের অধীনে ছিল।সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা কবিতা ও বীরত্বের ভক্ত ছিল, যা প্রায়ই অন্য গোত্রকে অপমান ও যুদ্ধ উসকে দিত।তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অসম এবং শোষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা, যা সাধারণকে দরিদ্র করে দিত।

৭/জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন:
রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি চরম অরাজকতা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের সম্মুখীন হন।ভিন্ন আদর্শের মানুষ ও বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়া চ্যালেঞ্জ।মদীনার এই জটিল প্রেক্ষাপটই পরবর্তীতে মদীনা সনদের মতো একটি ঐতিহাসিক সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্র গড়ে।

❇ হিজরতের সময়ে মদিনার সমাজচিত্র থেকে
শিক্ষা:

শিক্ষা-০১:বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে ধৈর্য এবং সমঝোতার মাধ্যমে ইসলামের শান্তিময় দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
শিক্ষা-০২: ষড়যন্ত্র এবং প্রতিকূলতার মাঝেও নৈতিকতা ও আদর্শের ওপর অটল থাকাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।
শিক্ষা-০৩: ধর্মীয় জ্ঞান যদি ব্যক্তির নৈতিকতা ও সততা উন্নত না করে, তবে তা সমাজ ও জাতির জন্য বোঝা।
শিক্ষা-০৪: অন্ধ গোত্রীয় আভিজাত্য কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে; শান্তি ও প্রগতির জন্য ক্ষমার মানসিকতা দরকার।

❖শিক্ষা-০৫: প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়া কোনো জনপদ প্রকৃত সুখ লাভ করে না।
❖শিক্ষা-০৬: অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন এবং সংস্কৃতি হওয়া উচিত সর্বদা ঐক্যের ভিত্তি।
❖শিক্ষা-০৭: চরম সংকটের মুহূর্তেও ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকলে বিশ্বের সব কঠিন সমস্যার সমাধান।

টপিক:০৫ - মদীনার প্রাথমিক দিনগুলো।

১/আনসারদের অভ্যর্থনা:
রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় পৌঁছান, তখন মদীনার অধিবাসীরা (আনসারগণ) তাঁকে অত্যন্ত আবেগ ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁদের প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। এটি ছিল মদীনার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

২/মসজিদে কুবা ও মদীনার প্রথম জুমুআ:
মদীনায় প্রবেশের পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেন। এরপর মদীনার পথে 'বনু সালেম' গোত্রের এলাকায় তিনি ইসলামের প্রথম জুমুআর নামাজ আদায় করেন এবং খুতবা প্রদান করেন।

৩/আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে অবস্থান:
মদীনায় প্রবেশের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উটনী আবু আইয়ুব আনসারির ঘরের সামনে বসে পড়ে। তিনি সেখানেই অবস্থান শুরু করেন। এটি ছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারির জন্য এক পরম সৌভাগ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

৪/মসজিদে নববী নির্মাণ:

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারির (রা.) ঘরের সামনের একটি খালি জায়গা ক্রয় করেন এবং সেখানে সাহাবীদের সাথে নিজে শারীরিক শ্রম দিয়ে পাথর ও কাঁচা ইট দিয়ে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি কেবল ইবাদতের জায়গা ছিল না, বরং ইসলামের প্রথম প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

৫/আযানের প্রচলন:

মসজিদে নববী নির্মাণের পর মুমিনদের সালাতের জন্য একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাহাবীদের সাথে পরামর্শকালে কেউ কেউ শিঙ্গা বাজানো বা আগুন জ্বালানোর প্রস্তাব দেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) সেগুলো পছন্দ করেননি। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো শুনতে পান। রাসূলুল্লাহ (সা.) এটি পছন্দ করেন এবং হযরত বিলালকে (রা.) উচ্চস্বরে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন।

৬/মদীনাকে ঘিরে নানা কার্যক্রম (মসজিদে নববি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন):

মদীনায় ভিত্তি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশাসনিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মসজিদে নববি নির্মাণ, যা কেবল ইবাদতের জায়গা নয় বরং শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে 'মুওয়াখাত' বা ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

৭/মদীনায় নিফাক, ইহুদিদের বিরোধিতা ও কিবলা পরিবর্তন:

মদীনায় ইসলাম শক্তিশালী হতে শুরু করলে একদল মানুষ প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেও মনে মনে কুফরি পোষণ করত, যাদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এছাড়া স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায় নানাবিধ বিরোধিতা শুরু করে। এরই মধ্যে আল্লাহর নির্দেশে কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে পরিবর্তিত হয়।

❁ মদিনার প্রাথমিক দিনগুলো থেকে শিক্ষা:

✧শিক্ষা-০১: ইসলামের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসা হলো মূল চালিকাশক্তি। দ্বীনের প্রয়োজনে আগন্তুক বা মজলুম ভাইদের সাদরে গ্রহণ করা এবং তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা ঈমানের অন্যতম দাবি।

✧শিক্ষা-০২: যেকোনো নতুন সমাজ বা বসতি স্থাপনে ইবাদতগাহ বা মসজিদকে কেন্দ্রে রাখা উচিত। জুমুআর গুরুত্ব হলো এটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক সম্মেলন এবং আত্মিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির বড় মাধ্যম।

✧শিক্ষা-০৩: দ্বীনের নেতাদের সেবা করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য অর্জন করা বরকতের বিষয়। নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও ত্যাগ একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে।

✧শিক্ষা-০৪: একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। এটি কেবল সালাতের জন্য নয়, বরং মুসলিমদের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সব ধরনের জ্ঞান অর্জনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

✧শিক্ষা-০৫: ইসলামের সকল কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং এটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি লালন করে। আযানের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচবার মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের ঘোষণা মুসলিমদের আল্লাহর স্মরণের দিকে আহ্বান জানায়।

✧শিক্ষা-০৬: একটি আদর্শ সমাজ গড়তে হলে ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র এবং মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রয়োজন। ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে অভাবী ও সচ্ছলদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা সম্ভব।

✧শিক্ষা-০৭: সত্যের পথে সবসময় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাধা আসবেই। মুনাফিকদের চক্রান্ত ও বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মুখেও আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল থাকা এবং একতাবদ্ধ থাকাই হলো মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

টপিক:০৬ - বদর যুদ্ধ।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ হলো বদর যুদ্ধ।এই যুদ্ধের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ:

হিজরি দ্বিতীয় সনের রমজান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিল। মুসলিমরা মক্কায় তাদের ফেলে আসা সম্পদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই কাফেলাটি আটকের পরিকল্পনা করেন। তবে আবু সুফিয়ান কৌশলে পথ পরিবর্তন করে রক্ষা পান এবং মক্কায় খবর পাঠান। এর প্রেক্ষিতে কুরাইশরা মক্কাবাসীদের সম্মানের দোহাই দিয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়।

সৈন্য সংখ্যা ও প্রস্তুতি:

- মুসলিম বাহিনী: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাদের কাছে ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া এবং ৭০টি উট। মুসলিমদের মূল শক্তি ছিল তাঁদের অটল ঈমান এবং আল্লাহর ওপর গভীর ভরসা।
- কুরাইশ বাহিনী: কুরাইশদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ জন। তাদের সাথে ছিল ১০০টি ঘোড়া, ৬০০টি বর্ম এবং প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র। আবু জেহেলের নেতৃত্বে তারা দাম্ভিকতার সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান:

১৭ই রমজান সকালে বদর প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন এবং সাহায্য চান। মুসলিমরা বদরের পানির কূপগুলোর নিকটবর্তী কৌশলগত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। যুদ্ধের শুরুতে আরবের প্রথা অনুযায়ী মল্লযুদ্ধ (দ্বৈত লড়াই) শুরু হয়। মুসলিমদের পক্ষ থেকে হামজা (রা), আলী (রা) এবং উবায়দা (রা) কুরাইশদের প্রধান বীরদের পরাজিত ও হত্যা করেন।

মূল লড়াই ও বিজয়:

মল্লযুদ্ধের পর কুরাইশরা সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করে। মুসলিমরা ধৈর্যের সাথে তাদের প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে গায়েবি সাহায্য অবতীর্ণ হয়। মুসলিমদের সাহসিকতা এবং সুশৃঙ্খল আক্রমণের মুখে কুরাইশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আবু জেহেলসহ কুরাইশদের বড় বড় নেতারা এই যুদ্ধে নিহত হয়। কাফেরদের চরম পরাজয় ঘটে এবং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের ফলাফল:

বদর যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ৭০ জন বন্দি হয়। মুসলিমদের পক্ষ থেকে মাত্র ১৪ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই বিজয় ইসলামের ভিত্তি মজবুত করে এবং আরবে মুসলিমদের শক্তি ও মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এটি ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যের এক চূড়ান্ত মানদণ্ড।

❇️বদর যুদ্ধের শিক্ষা ও তাৎপর্য:

বদর যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক বিজয় ছিল না, বরং এটি ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার এক আদর্শিক লড়াই। ' এই যুদ্ধ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো পাওয়া যায়, তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা (তাওয়াক্কুল):

বদর যুদ্ধের প্রধান শিক্ষা হলো সংখ্যা বা অস্ত্রের আধিক্য নয়, বরং আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাসই বিজয়ের মূল চাবিকাঠি। মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় এবং যুদ্ধোপকরণে কুরাইশদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যের ওপর পূর্ণ ভরসা রেখেছিলেন। পবিত্র কুরআনেও এই গায়েবি সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পরামর্শ ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত (শুরা):

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের রণকৌশল এবং অবস্থানের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হুবাব বিন মুনযির (রা)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী পানির কূপের নিকটবর্তী স্থানে সৈন্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্তটি ছিল একটি সামরিক ও কৌশলগত পরামর্শের

ফসল। এটি প্রমাণ করে যে, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. নেতার প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলা:

সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের প্রতি ছিলেন পূর্ণ অনুগত। আনসার ও মুহাজিরদের এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং শৃঙ্খলাই তাঁদের জয়ের পথ সুগম করেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমীরের নির্দেশ পালন করা যে কোনো সফলতার পূর্বশর্ত।

৪. বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা:

বদর যুদ্ধে সাহাবীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও সত্যের পক্ষে লড়াই করেছেন। এখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানি সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠায় কোনো প্রকার আপস না করা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ:

যুদ্ধের পর বন্দিদের সাথে মুসলিমদের আচরণ ছিল অত্যন্ত মানবিক। শিক্ষিত বন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে মদীনার শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এটি ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এবং যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদয় ব্যবহারের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে।

৬. ধৈর্যের গুরুত্ব (সবর):

প্রতিপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখেও মুসলিমরা বিচলিত হননি। চরম প্রতিকূলতার মাঝে ধৈর্য ধারণ এবং যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তি জোগায়। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন—এই সত্য বদরের ময়দানে প্রমাণিত হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধ:

উহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো। বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা এই যুদ্ধের সুচনা করে।

যুদ্ধের পটভূমি ও প্রস্তুতি:

হিজরি তৃতীয় সনের শওয়াল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের সাথে ছিল ২০০টি ঘোড়া এবং ৭০০টি বর্ম। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে বের হলেও মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ সৈন্য নিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যায়। ফলে মাত্র ৭০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নেন।

রণকৌশল ও তীরের পাহাড়:

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ময়দানে অত্যন্ত বিচক্ষণ সামরিক কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা)-এর নেতৃত্বে ৫০ জন দক্ষ তীরন্দাজকে উহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথে (জাবালে রুমাত) মোতায়েন করেন। তাদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয় যে—জয় হোক বা পরাজয়, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন কোনো অবস্থাতেই সেই স্থান ত্যাগ না করেন। এই কৌশলটি ছিল কুরাইশদের পিছন থেকে করা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য।

যুদ্ধের সূচনা ও প্রাথমিক বিজয়:

যুদ্ধের শুরুতে আরবের রীতি অনুযায়ী মল্লযুদ্ধ শুরু হয়। আলী (রা) এবং হামজা (রা) কুরাইশদের পতাকাবাহীদের একের পর এক নিধন করেন। এরপর শুরু হয় তুমুল সাধারণ যুদ্ধ। মুসলিমদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। মুসলিমরা নিশ্চিত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান এবং শত্রুদের ফেলে যাওয়া গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

তীরন্দাজদের ভুল ও পরিস্থিতির পরিবর্তন:

পাহাড়ে মোতায়েনকৃত ৫০ জন তীরন্দাজের মধ্যে ৪০ জন মনে করেছিলেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কঠোর নির্দেশ ভুলে গণিমত সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের পাদদেশে নেমে আসেন। কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে পাহাড় ঘুরে পিছন থেকে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। এই আকস্মিক হামলায় মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন সংকটাপন্ন:

যুদ্ধের এই পর্যায়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়েছেন। এতে মুসলিমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন; তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয় এবং হেলমেটের কড়া তাঁর চেহারায় ঢুকে যায়। একদল নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাঁকে ঘিরে মানবঢাল তৈরি করেন। বিশেষ করে আবু দুজানা (রা), তালহা (রা) এবং উম্মে আম্মারা (রা) সাহসিকতার সাথে তাঁকে রক্ষা করেন।

যুদ্ধের সমাপ্তি ও শাহাদাত:

এই যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, যাঁদের মধ্যে ইসলামের বীর সেনানি হামজা (রা) ছিলেন অন্যতম। কুরাইশরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে না পারলেও মুসলিমদের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। আবু সুফিয়ান শেষ পর্যন্ত মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিমরা তাঁদের শহীদদের উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করেন।

❇ উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা ও তাৎপর্য:

উহুদ যুদ্ধ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশাল পরীক্ষাগার ছিল। এই যুদ্ধের পরাজয় ও বিপর্যয় থেকে প্রাপ্ত মূল শিক্ষাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নেতার আদেশের পূর্ণ আনুগত্য:

উহুদ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো সেনাপতির আদেশের গুরুত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজ বাহিনীকে যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সেই আদেশের সামান্য বিচ্যুতি নিশ্চিত বিজয়কে বিপর্যয়ে রূপান্তর করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে, নেতার নির্দেশ পালনে শিথিলতা সংগঠনের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

২. পার্থিব মোহের কুফল:

যুদ্ধের এক পর্যায়ে অনেক সাহাবী মনে করেছিলেন বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং তারা গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই সাময়িক পার্থিব মোহ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দ্বীনি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য দুনিয়াবী স্বার্থের চেয়ে লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা কতটা জরুরি, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়।

৩. ধৈর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা:

বিপর্যস্ত অবস্থায় যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়েছেন, তখন অনেক সাহাবী ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু আনাস বিন নযর (রা)-এর মতো বীরেরা বলেছিলেন, "রাসূল ﷺ যদি শহীদ হয়ে থাকেন, তবে তাঁর আদর্শের ওপর জীবন দিয়ে দাও।" এটি শিখিয়ে দেয় যে, কঠিন বিপদেও মনোবল হারানো যাবে না এবং আদর্শের পথে অটল থাকতে হবে।

৪. নবীর মানুষ হওয়া ও আল্লাহর কুদরত:

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হওয়া এবং তাঁর দাঁত শহীদ হওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং আল্লাহর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। এটি উম্মাহকে সতর্ক করে দেয় যে, ইসলাম কোনো ব্যক্তির ওপর নয়, বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর উম্মাহ কীভাবে ধৈর্য ধরবে, তার এক মহড়া ছিল এই যুদ্ধ।

৫. মুনাফিকদের চিনে নেওয়া:

যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ অনুসারী নিয়ে সটকে পড়েছিল। উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের কাতার থেকে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়।

একটি আদর্শিক দলের জন্য বাহ্যিক শত্রুর চেয়ে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নেওয়া এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৬. পরাজয় ও ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ:

উহুদ যুদ্ধ শিখিয়ে দেয় যে, পরাজয় মানেই শেষ নয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ভুলত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দেন। এই যুদ্ধের পরেই মুসলিমরা নিজেদের রণকৌশল এবং শৃঙ্খলা আরও মজবুত করেছিলেন, যা পরবর্তীতে খন্দক ও মক্কা বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোই মুমিনের কাজ।

খন্দক যুদ্ধ:

ইসলামের ইতিহাসে খন্দক যুদ্ধ (বা আহযাব যুদ্ধ) ছিল একটি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

যুদ্ধের পটভূমি ও মহাজোট গঠন:

হিজরি পঞ্চম সনের শাওয়াল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনু নাযীর গোত্রের ইহুদিরা মক্কার কুরাইশ এবং আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে (যেমন গাতফান, ফাযারা) মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। এভাবে প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল 'আহযাব' বা সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় সম্মিলিত আক্রমণ।

সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ ও পরিখা খনন:

শত্রুদের বিশাল বাহিনীর খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ সভায় বসেন। পারস্যের সাহাবী সালমান ফারসী (রা) মদীনার সুরক্ষায় এক অভিনব কৌশল প্রস্তাব করেন—শহরের চারপাশে 'খন্দক' বা পরিখা খনন করা। আরবে এই কৌশল আগে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ৩,০০০ সাহাবীকে নিয়ে মাত্র ১৫ দিনে মদীনার উত্তর দিকে বিশাল পরিখা খনন সম্পন্ন করেন।

অবরোধ ও কঠিন পরীক্ষা:

মদীনার তিন দিক পাহাড় ও খেজুর বাগান দিয়ে ঘেরা ছিল, তাই কাফেররা কেবল উত্তর দিক দিয়েই আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু সেখানে বিশাল পরিখা দেখে তারা থমকে দাঁড়ায়। তারা মদীনা অবরোধ করে রাখে। প্রায় এক মাস ধরে এই অবরোধ চলে। এর মধ্যে মদীনার ভেতরের ইহুদি গোত্র 'বনু কুরাইযা' মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফেরদের সাথে হাত মেলায়। ফলে মুসলিমরা এক চরম সংকটের মুখে পড়েন।

নুআইম বিন মাসউদ (রা)-এর ভূমিকা:

এই সংকটময় মুহূর্তে নুআইম বিন মাসউদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর শত্রুরা জানত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে কুরাইশ এবং ইহুদি বনু কুরাইযা গোত্রের মধ্যে সন্দেহ ও ফাটল ধরিয়ে দেন। এর ফলে শত্রুপক্ষের ঐক্যে ধস নামে এবং তারা একে অপরকে অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়:

অবরোধের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যে এক প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া এবং প্রচণ্ড শীত প্রেরণ করেন। এই ঝড়ে কাফেরদের তাবু উপড়ে যায়, রান্নার হাঁড়ি উল্টে যায় এবং ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটে পালায়। এক অলৌকিক আতঙ্কে কুরাইশ ও তাদের মিত্র বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। কোনো বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন।

যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য:

খন্দক যুদ্ধে কাফেরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন, "আজকের পর কুরাইশরা আর আমাদের আক্রমণ করবে না, বরং আমরাই তাদের আক্রমণ করব।" এই যুদ্ধের মাধ্যমে আরবে মুসলিমদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। খন্দকের পরই বিশ্বাসঘাতক বনু কুরাইযা গোত্রের বিচার সম্পন্ন করা হয়।

❁ খন্দক যুদ্ধের শিক্ষা ও তাৎপর্য:

খন্দক যুদ্ধ বা আহযাব যুদ্ধ ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য ধৈর্য এবং রণকৌশলের এক চরম পরীক্ষা। এই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক রণকৌশল:

খন্দক যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো সময়ের প্রয়োজনে নতুন ও কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করা। সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে পরিখা খননের বিষয়টি আরবে অভূতপূর্ব ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংকীর্ণমনা না হয়ে অন্য সংস্কৃতির (পারস্যের) ভালো ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, দ্বীন রক্ষায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহার আবশ্যক।

২. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত (শুরা):

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সিদ্ধান্তে সাহাবীদের মতামত নিতেন। খন্দক খননের সিদ্ধান্তটি ছিল সম্মিলিত পরামর্শের ফসল। এটি উম্মাহকে শিক্ষা দেয় যে, যেকোনো বড় সংকট মোকাবিলায় একনায়কতন্ত্রের চেয়ে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বেশি কার্যকর এবং বরকতময়।

৩. নেতার সাথে কর্মীদের একাত্মতা:

পরিখা খননের সময় সাহাবীরা প্রচণ্ড ক্ষুধা ও শীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি নিজেও সাহাবীদের সাথে মাটি কেটেছেন এবং পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধা সহ্য করেছেন। নেতার এই ত্যাগ ও অংশগ্রহণ কর্মীদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যা যেকোনো বিজয়ের জন্য অপরিহার্য।

৪. কঠিন বিপদেও আল্লাহর সাহায্যের ওপর বিশ্বাস:

যখন ১০,০০০ সৈন্য মদীনা ঘিরে ফেলেছিল এবং ভেতরের ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তখন মুমিনদের ঈমানি পরীক্ষা হয়েছিল। চরম প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁরা আল্লাহর ওপর আস্থা হারাননি। আল্লাহ তাআলা ঝোড়ো হাওয়া পাঠিয়ে শত্রুদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। এটি শিখিয়ে দেয় যে, মানুষ যখন তার সাধ্যমতো চেষ্টা শেষ করে, তখন আল্লাহর বিশেষ সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

৫. মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও কূটনীতি:

নুআইম বিন মাসউদ (রা) তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শত্রুপক্ষের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এটি যুদ্ধের একটি বড় শিক্ষা—সব সময় তলোয়ার দিয়ে নয়, বরং সঠিক

সময়ে সঠিক কূটনৈতিক চাল এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করে বড় বড় শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব।

৬. মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নেওয়া:

শান্তির সময় সবাই সাথে থাকলেও কঠিন বিপদে মুনাফিকরা দূরে সরে যায়। খন্দক যুদ্ধের মাধ্যমে মদীনার ভেতরের ইহুদি বনু কুরাইযা এবং মুনাফিকদের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অভ্যন্তরীণ শত্রুদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হওয়া কতটা জরুরি, তা এই যুদ্ধ থেকে স্পষ্ট হয়।

বনু কুরাইযা যুদ্ধ:

খন্দক যুদ্ধের পরপরই বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়।এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

অভিযানের পটভূমি ও কারণ:

খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা মদীনার ভেতর থেকে কুরাইশ ও আহযাব বাহিনীর সাথে গোপন আঁতাত করে মুসলিমদের ওপর পেছন থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে আল্লাহর পক্ষ থেকে বনু কুরাইযার বিচার করার নির্দেশ পৌঁছে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষণা ও যাত্রা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশ্যেঘোষণা করলেন: *"তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামাজ না পড়ে।"* এই নির্দেশের পর ৩,০০০ পদাতিক এবং ৩৬ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী বনু কুরাইযার দুর্গের দিকে রওনা হন। তারা গিয়ে ইহুদিদের দুর্গগুলো চারপাশ থেকে অবরোধ করেন।

অবরোধ ও আত্মসমর্পণ:

বনু কুরাইযার অবরোধ ২৫ দিন স্থায়ী হয়। মুসলিমদের কঠোর অবরোধের মুখে ইহুদিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিল—ইসলাম গ্রহণ করা, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে আমরণ লড়াই করা অথবা শনিবার অতর্কিত আক্রমণ করা। কিন্তু তারা কোনোটিতেই একমত হতে পারেনি। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

বিচারক নিয়োগ ও চূড়ান্ত ফয়সালা:

বনু কুরাইযা গোত্র আগে আউস গোত্রের মিত্র ছিল। তাই তারা অনুরোধ করে যেন আউস গোত্রের কাউকে তাদের বিচারক নিয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা)-কে বিচারক হিসেবে মনোনীত করেন। সা'দ (রা) খন্দক যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তিনি তাওরাতের বিধান অনুযায়ী এই চূড়ান্ত ফয়সালা দেন যে:

- যুদ্ধের উপযুক্ত পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।
- নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে।
- তাদের সমস্ত সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ফয়সালা শুনে বলেছিলেন, *"সা'দ, তুমি সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহর দেওয়া ফয়সালাই শুনিয়েছ।"*

দণ্ড কার্যকর ও ফলাফল:

সা'দ (রা)-এর ফয়সালা অনুযায়ী মদীনার বাজারে গর্ত খনন করা হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্তদের দণ্ড কার্যকর করা হয়। এর মাধ্যমে মদীনার ভেতর থেকে ষড়যন্ত্রের শেষ মূলটি উপড়ে ফেলা হয়। মদীনা একটি নিষ্কণ্টক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং বাইরের শত্রুরাও বুঝতে পারে যে মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

❇বনু কুরাইযা যুদ্ধ থেকে শিক্ষা ও তাৎপর্য:

১. চুক্তির পবিত্রতা ও রক্ষা করা:
ইসলামে সম্পাদিত চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বনু কুরাইযা মদীনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই যুদ্ধ শিক্ষা দেয় যে, রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত যেকোনো চুক্তি ভঙ্গ করা কেবল অনৈতিক নয়, বরং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। চুক্তির বরখেলাপ করলে তার কঠিন মূল্য দিতে হয়।
২. অভ্যন্তরীণ শত্রুর ভয়াবহতা:
খন্দক যুদ্ধের সময় বাইরের ১০,০০০ সৈন্যের চেয়েও মদীনার ভেতরে থাকা বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিমদের জন্য বেশি বিপজ্জনক ছিল। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, বাইরের প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে ঘরের ভেতরের গোপন শত্রু বা বিশ্বাসঘাতকরা বেশি ক্ষতিকর। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।
৩. নেতার নির্দেশের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন:
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নির্দেশ দিলেন যে বনু কুরাইযায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের নামাজ না পড়ে, তখন সাহাবীরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে নামাজের সময় হয়ে গেলেও অনেকে রাসূল ﷺ-এর আদেশের আক্ষরিক অর্থ পালন করতে গিয়ে সেখানে গিয়ে নামাজ পড়েন। এটি নেতার নির্দেশের প্রতি আনুগত্য ও ক্ষিপ্রতার এক অনন্য শিক্ষা।
৪. নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা:
বনু কুরাইযা নিজেরাই সা'দ বিন মুআয (রা)-কে বিচারক হিসেবে বেছে নিয়েছিল, কারণ তিনি তাদের পূর্বতন মিত্র ছিলেন। সা'দ (রা) ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের ঊর্ধ্বে উঠে তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, বিচারে কোনো পক্ষপাতিত্ব চলে না এবং অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড হওয়াই ন্যায়বিচারের দাবি।
৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সাহায্য:
যখন কোনো জাতি সত্যের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ শত্রুদের অন্তরে ভীতি (রু'ব) সৃষ্টি করে দেন। বনু কুরাইযা শক্তিশালী দুর্গে অবস্থান করা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক অলৌকিক ভীতির কারণে তারা লড়াই না করেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

৬. ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন:

ইসলাম শান্তি ও ক্ষমার ধর্ম হলেও যারা বারবার সুযোগ পেয়েও ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হয়, তাদের ব্যাপারে কঠোর হওয়া আবশ্যক। মদীনার শান্তি বজায় রাখার জন্য এই কঠোর পদক্ষেপ ছিল অপরিহার্য। এটি শিখিয়ে দেয় যে, বৃহত্তর শান্তির স্বার্থে মাঝে মাঝে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ (যা 'মুরাইসী' যুদ্ধ নামেও পরিচিত) ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি হিজরি পঞ্চম বা ষষ্ঠ সনের শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

যুদ্ধের কারণ:

বনু মুস্তালিক গোত্রের প্রধান হারিস বিন আবি দিরার মদীনা আক্রমণের জন্য তার গোত্র এবং আশেপাশের আরবদের একত্রিত করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই খবর পাওয়ার পর এর সত্যতা যাচাই করেন এবং নিশ্চিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সাহাবীদের নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হন।

যুদ্ধের ঘটনা ও বিজয়:

মুসলিম বাহিনী 'মুরাইসী' নামক একটি কূপের ধারে বনু মুস্তালিক গোত্রের মুখোমুখি হন। যুদ্ধের শুরুতে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে লড়াই শুরু হয়। মুসলিমদের অতর্কিত ও সুশৃঙ্খল আক্রমণে বনু মুস্তালিক গোত্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে তাদের ১০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং বাকিরা বন্দি হয়। বিপুল পরিমাণ গবাদিপশু ও সম্পদ গণিমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয়।

সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব:

এই যুদ্ধে হারিস বিন আবি দিরারের কন্যা জুওয়াইরিয়া (রা) বন্দি হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে সাহাবীরা বনু মুস্তালিক গোত্রের সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দেন, কারণ তাঁরা এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্বশুরবাড়ির লোক। এই মহানুভবতা দেখে পুরো বনু মুস্তালিক গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।

যুদ্ধের সময়কার দুটি বড় সংকট (মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র):

এই যুদ্ধের ময়দানে বড় কোনো সামরিক লড়াই না হলেও মদীনার মুনাফিকরা দুটি বড় অভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি করেছিল:

১. আনসার ও মুহাজির দ্বন্দ্বের অপচেষ্টা: কূপ থেকে পানি তোলা নিয়ে একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের মধ্যে ঝগড়া হলে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই একে উসকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সে বলেছিল, "মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিতরা (মুনাফিকরা) অবশ্যই লাঞ্ছিতদের (মুসলিমদের) বের করে দেবে।" তখন আল্লাহ তাআলা 'সূরা মুনাফিকুন' নাযিল করে তার মিথ্যাচার প্রকাশ করে দেন।

২. ইফকের ঘটনা (আয়িশা রা.-এর ওপর অপবাদ): এই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকরা জঘন্য অপবাদ রটনা করে। এটি মুসলিম সমাজে এক বিশাল অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

এই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ: শত্রুর ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে অপরিহার্য।
- মানবিকতা ও বৈবাহিক সম্পর্ক: রাসূলুল্লাহ ﷺ জুওয়াইরিয়া (রা)-কে বিবাহ করে একটি বিদ্রোহী গোত্রকে পরম মিত্রে পরিণত করেন। এটি ইসলামের দাওয়াতের এক অনন্য কৌশল।
- মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা: কঠিন সময়ে মুনাফিকরা সবসময় বিভেদ তৈরির চেষ্টা করে। মুসলিম উম্মাহর উচিত ঐক্য বজায় রাখা।
- ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা: অপবাদের মতো কঠিন সামাজিক সংকটেও ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ নিজেই সত্য প্রকাশ করে দেন।

টপিক:০৭ - হুদাইবিয়ার সন্ধি।

ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি একটি 'সুস্পষ্ট বিজয়' হিসেবে স্বীকৃত। এই সন্ধির প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলি নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. প্রেক্ষাপট ও উমরার নিয়ত:
৬ষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছেন এবং উমরা পালন করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি ১৪০০ সাহাবীকে সাথে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তাঁরা কেবল তলোয়ার (খাপবদ্ধ অবস্থায়) সাথে নিয়েছিলেন এবং কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করে সাথে নিয়েছিলেন।

২. কুরাইশদের বাধা ও অবস্থান:
মুসলিমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছান, তখন খবর আসে যে কুরাইশরা তাঁদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তপাত এড়ানোর জন্য মূল রাস্তা ছেড়ে দুর্গম পথ দিয়ে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে গিয়ে তাবু গাড়েন।
৩. উসমান (রা)-এর দূত হিসেবে প্রেরণ ও বাইয়াতে রিদওয়ান:
শান্তি আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান (রা)-কে মক্কায় পাঠান। কিন্তু মক্কায় তাঁর ফিরতে দেরি হওয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কুরাইশরা তাঁকে শহীদ করেছে। এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে সাহাবীদের কাছ থেকে আমরণ লড়াইয়ের শপথ নেন, যা ইতিহাসে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। আল্লাহ এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন।

৪. সুহাইল বিন আমর ও সন্ধির শর্তাবলী:
পরবর্তীতে উসমান (রা) ফিরে আসেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর সন্ধি করার জন্য আসেন। দীর্ঘ আলোচনার পর একটি লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির প্রধান শর্তগুলো ছিল:

- আগামী ১০ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

- মুসলিমরা এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর এসে ৩ দিন অবস্থান করতে পারবেন।
- মক্কার কোনো ব্যক্তি (অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া) মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে, কিন্তু মদীনার কেউ মক্কায় এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
- আরবের যেকোনো গোত্র চাইলে মুসলিমদের সাথে বা কুরাইশদের সাথে মৈত্রীর চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।

৫. সাহাবীদের মানসিক অবস্থা ও আবু জানদাল (রা):

সন্ধির শর্তগুলো ظاهري ভাবে (বাহ্যিকভাবে) মুসলিমদের বিপক্ষে মনে হওয়ায় সাহাবীরা অত্যন্ত ব্যথিত হন। বিশেষ করে উমর (রা) এই চুক্তিতে মর্মাহত হয়েছিলেন। চুক্তিনামা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সুহাইল বিন আমরের ছেলে আবু জানদাল (রা) মক্কার কারাগার থেকে শিকল পরা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় চান। কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন, যা ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি দৃশ্য।

❇️ এই সন্ধি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও ফলাফল:

- দূরদর্শী নেতৃত্ব: সাহাবীরা প্রাথমিকভাবে ব্যথিত হলেও এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক অসাধারণ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয়।

- শান্তির সুযোগ: ১০ বছরের যুদ্ধবিরতির ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ তৈরি হয়। সন্ধির পরবর্তী দুই বছরে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন, তা আগের ১৯ বছরেও হয়নি।

- মক্কা বিজয়ের চাবিকাঠি: এই সন্ধির মাধ্যমেই কুরাইশরা পরোক্ষভাবে মুসলিমদের একটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীকালে কুরাইশরাই এই সন্ধি ভঙ্গ করে, যা মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

- ধৈর্যের পুরস্কার: আল্লাহ তাআলা এই সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' হিসেবে ঘোষণা করেন।রাজা বাদশাহের কাছে চিঠি।

রাজা বাদশাহের কাছে চিঠি

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে আরবে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হিজরি সপ্তম সনের শুরুতেই বিশ্বের প্রভাবশালী রাজা ও সম্রাটদের কাছে পত্রপ্রেরণের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

১.
চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন সাহাবীরা জানালেন যে, আরবের বাইরের সম্রাটরা মোহরহীন কোনো চিঠি গ্রহণ করেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান, যাতে তিনটি লাইনে 'মুহাম্মদ-রাসূল-আল্লাহ' খোদাই করা ছিল। এই আংটিটিই চিঠির সিল বা মোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো

২. হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পত্র:
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরী (রা)-কে হাবশার (বর্তমান ইথিওপিয়া) সম্রাট আসহামা ইবনে আবজারের কাছে পাঠান। সম্রাট নাজ্জাশী অত্যন্ত সম্মানের সাথে চিঠিটি গ্রহণ করেন এবং তা চোখে স্পর্শ করেন। তিনি জাফর বিন আবু তালিব (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনুগত্যের পত্র পাঠান।

৩. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র:
দিহিয়া বিন খলিফা কালবী (রা)-কে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো হয়। সম্রাট তখন জেরুজালেমে অবস্থান করছিলেন। তিনি চিঠিটি পড়ে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মক্কার তৎকালীন নেতা আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠান। আবু সুফিয়ানের বর্ণনায় ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, "তিনি যদি এখানে

থাকতেন, তবে আমি তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।" যদিও সিংহাসন হারানোর ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

৪. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র:
আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমী (রা)-কে পারস্যের সম্রাট খসরুর কাছে পাঠানো হয়। অহংকারী খসরু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম নিজের নামের উপরে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে। এই খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করেছিলেন—"আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দিন।" এর কিছুদিন পরই খসরু তার নিজ ছেলের হাতে নিহত হয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

৫. মিসর অধিপতি মুকাউকিসের নিকট পত্র:
হাতিব বিন আবি বালতায়া (রা)-কে মিসরের অধিপতি মুকাউকিসের কাছে পাঠানো হয়। তিনি চিঠিটি পড়ে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মারিয়া কিবতিয়া (রা) ও তাঁর বোনসহ বেশ কিছু মূল্যবান উপহার পাঠান। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন।

❇ পত্রগুলোর মূল বক্তব্য ও শিক্ষা:

- দাওয়াতের ভাষা: প্রতিটি চিঠির শুরু ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। চিঠিতে সাধারণত বলা হতো—"শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে হেদায়েত অনুসরণ করে। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন।

- পার্থিব ক্ষমতা বনাম সত্য: অনেক সম্রাট সত্য বুঝলেও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি। এটি প্রমাণ করে যে, সত্য জানা আর সত্য মানা এক বিষয় নয়।

- বিচক্ষণ কূটনীতি: রাসূলুল্লাহ ﷺ দক্ষ ও ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন সাহাবীদের দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, যা আধুনিক কূটনীতির এক অনন্য উদাহরণ।

- আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: এই পত্রগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে যায় এবং মদীনা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পায়।

খাইবার যুদ্ধ

হিজরি সপ্তম সনের মহররম মাসে খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনা থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা খায়বারে একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই যুদ্ধের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও যাত্রা:

খায়বার ছিল আরবের ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ এবং উর্বর কৃষিজমি। মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর গোত্র এখানে এসে আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দিচ্ছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কেবল সেই ১৪০০ সাহাবীকে সাথে নেন, যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

২. খায়বারের দুর্গসমূহ ও অবরোধ:

খায়বার মূলত ছোট-বড় আটটি দুর্গের সমন্বয়ে গঠিত ছিল (যেমন: নাইম, আল-কামুস, আশ-শেক ইত্যাদি)। মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত গোপনে খায়বারে পৌঁছে তাদের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইহুদিরা তাদের দুর্গের ভেতর অবস্থান নিয়ে লড়াই শুরু করে। একের পর এক দুর্গ জয় করা মুসলিমদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল।

৩. আলী (রা)-এর বীরত্ব ও বিজয়:

যুদ্ধের এক পর্যায়ে 'কামুস' নামক শক্তিশালী দুর্গটি জয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন, *"আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে ঝাণ্ডা (পতাকা) দেব, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন এবং সেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে*

ভালোবাসে। তার হাতেই বিজয় আসবে।" পরদিন তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁর চোখের অসুস্থতা সারিয়ে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। আলী (রা) ইহুদিদের বিখ্যাত বীর 'মারহাব'কে দ্বৈত লড়াইয়ে পরাজিত ও হত্যা করেন। এরপর মুসলিমদের প্রচণ্ড আক্রমণে একের পর এক দুর্গগুলোর পতন ঘটে।

৪. সন্ধি ও ফলাফল:

ইহুদিরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। চুক্তিতে ঠিক হয় যে:

- খায়বারের জমি ইহুদিদের হাতেই থাকবে, তবে তারা সেখানে শ্রম দেবে।
- উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অংশ মুসলিমদের দিতে হবে।
- মুসলিমরা চাইলে যেকোনো সময় তাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

এই যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদি নিহত হয় এবং ১৫ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা:
খায়বার জয়ের পর জনৈক ইহুদি নারী জয়নাব বিনতে হারিস রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে ছাগলের মাংসে বিষ মিশিয়ে উপহার দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক টুকরো মুখে দিয়েই বুঝতে পারেন যে এতে বিষ আছে। তিনি তা থুথু করে ফেলে দেন, তবে তাঁর সাথে থাকা বিশর বিন বারা (রা) সেই মাংস খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন। এই বিষের প্রভাব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমৃত্যু অনুভব করেছিলেন।

❇খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- খাদ্য নিরাপত্তা: খায়বার বিজয়ের ফলে মুসলিমদের দীর্ঘদিনের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হয়। আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, "খায়বার বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা পেট ভরে খাবার পাইনি।"

- নেতৃত্বের মর্যাদা: আলী (রা)-এর হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার ঘটনাটি তাঁর বিশেষ মর্যাদা এবং বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ।
- সতর্কতা: শত্রুর দেওয়া উপহার বা খাবারের বিষয়ে কতটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তা বিষ প্রয়োগের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়।
- সম্পদ বণ্টন: বিজিত অঞ্চলের জমি ও ফসলের সুষম বণ্টন একটি স্থিতিশীল অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করে।

মুতার যুদ্ধ।

হিজরি অষ্টম সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল মুসলিমদের সাথে রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যেরপ্রথম সরাসরি সংঘাত।এই যুদ্ধের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট:
রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস বিন উমায়ের আল-আযদি (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে রোমান সম্রাটের অধীনস্থ বলকার শাসক শুরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানি তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করে। দূতকে হত্যা করা তৎকালীন আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ছিল। এর প্রতিবাদে এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান।

২. নেতৃত্ব নির্ধারণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ:
রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে তিনজনকে মনোনীত করেন:
১. যায়েদ বিন হারিসা (রা): তিনি শহীদ হলে নেতৃত্ব দেবেন—
২. জাফর বিন আবু তালিব (রা): তিনিও শহীদ হলে নেতৃত্ব দেবেন—
৩. আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা)।
যদি তিনজনেই শহীদ হন, তবে মুসলিমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করবেন।

৩. সৈন্য সংখ্যার অসমতা:

মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ১ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছেন এবং তাদের সাথে আরও ১ লক্ষ খ্রিষ্টান আরব গোত্র যোগ দিয়েছে। ৩,০০০ মুসলিম সৈন্যের বিপরীতে ২ লক্ষ শত্রু সৈন্যের এই অসম লড়াই ছিল অকল্পনীয়। সাহাবীরা প্রথমে ইতস্তত করলেও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা)-এর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে সবাই শাহাদাতের তামান্নায় লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন।

৪. তিন সেনাপতির বীরত্ব ও শাহাদাত:

- যায়েদ বিন হারিসা (রা): যুদ্ধের শুরুতে বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে তিনি শহীদ হন।
- জাফর বিন আবু তালিব (রা): তিনি পতাকা তুলে ধরেন। তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন হলে বাম হাতে পতাকা ধরেন, বাম হাতও বিচ্ছিন্ন হলে দুই বাহু দিয়ে পতাকা জড়িয়ে ধরেন। অবশেষে তিনি শহীদ হন। (আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে দুটি ডানা দিয়েছেন বলে তিনি 'জাফর আত-তৈয়ার' বা উড়ন্ত জাফর নামে পরিচিত)।
- আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা): তিনিও সাহসিকতার সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

৫. খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর রণকৌশল:

তিন সেনাপতির শাহাদাতের পর মুসলিমরা সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করেন। তিনি চরম বুদ্ধিমত্তা ও নতুন রণকৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস পরিবর্তন করেন (ডান দিকের সৈন্যদের বামে এবং সামনের সৈন্যদের পিছনে পাঠান), যাতে শত্রুরা মনে করে নতুন কোনো সাহায্যকারী বাহিনী এসেছে। এতে রোমানরা ভীত হয়ে পড়ে। খালিদ (রা) অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে মুসলিম বাহিনীকে মদীনার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই যুদ্ধে খালিদ (রা)-এর হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙেছিল।

- সাহসিকতা ও ঈমান: ৩,০০০ সৈন্যের ২ লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করা কেবল অটল ঈমানের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।
- নেতৃত্বের উত্তরাধিকার: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব নির্ধারণ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।
- রণকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা: খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) প্রমাণ করেছেন যে, কেবল সংখ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি ও কৌশল দিয়েও নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- শাহাদাতের মর্যাদা: সাহাবীদের কাছে বিজয় বা শাহাদাত—উভয়ই ছিল কাঙ্ক্ষিত। এই যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ (রা)-কে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করেন।

টপিক:০৮ - মক্কা বিজয়।

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যা হিজরি অষ্টম সনের ২০শে রমজান সংঘটিত হয়। এই বিজয়ের বিবরণ নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. সন্ধি ভঙ্গ ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী আরবের গোত্রগুলো মুসলিম বা কুরাইশদের সাথে মৈত্রীর চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। বনু খুযাআ গোত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে চুক্তি করে। কিন্তু বনু বকর হঠাৎ বনু খুযাআকে আক্রমণ করে এবং কুরাইশরা গোপনে তাদের অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। এটি ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বনু খুযাআ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মক্কা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।

২. মক্কার দিকে যাত্রা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন যাতে রক্তপাত ছাড়াই মক্কা জয় করা যায়। ১০ই রমজান তিনি ১০,০০০ সাহাবীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। মক্কার নিকটবর্তী 'মাররুজ যাহরান' নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী তাবু গাড়ে। রাতে মুসলিমরা হাজার হাজার মশাল জ্বালালে কুরাইশরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

৩. আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ:

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বের হলে মুসলিমদের হাতে ধরা পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে আসেন। সেখানে ইসলামের সত্যতা ও মুসলিমদের বিশালতা দেখে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন:

- "যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।"
- "যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে সে নিরাপদ।"
- "যে পবিত্র কাবার চত্বরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।"

৪. মক্কায় প্রবেশ ও বিজয়:

রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দেন। তিনি সেনাপতিদের কঠোর নির্দেশ দেন যে, আক্রান্ত না হলে যেন কোনোভাবেই তলোয়ার না চালানো হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর বাহিনী সামান্য বাধার সম্মুখীন হলেও বাকিরা নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত বিনম্রভাবে উটের পিঠে মাথা নিচু করে মক্কায় প্রবেশ করেন। এটি ছিল কোনো অহংকারহীন এক বিজয় মিছিল।

৫. কাবাঘর পবিত্রকরণ ও সাধারণ ক্ষমা:

মক্কায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমেই কাবার ভেতরে ও চারপাশে থাকা ৩৬০টি মূর্তি অপসারণ ও ধ্বংস করেন। তিনি মক্কার সেই কুরাইশ নেতাদের সামনে দাঁড়ালেন যারা দীর্ঘ ২০ বছর তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, *"হে কুরাইশরা, তোমরা আমার থেকে আজ কী ব্যবহার আশা করো?"* তারা উত্তরে বলল, *"আপনি একজন মহান ভাই এবং মহান ভাইয়ের সন্তান।"* তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, *"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত!"* এটি ইতিহাসে 'সাধারণ ক্ষমা' হিসেবে পরিচিত।

৬. বিলাল (রা)-এর আযান ও ফলাফল:

কাবাঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে বিলাল (রা) উচ্চস্বরে আযান দেন। মক্কার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এই বিজয়ের ফলে আরবে কুফরের দাপট চিরতরে শেষ হয় এবং মক্কা একটি পবিত্র ও ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

❇️মক্কা বিজয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- ক্ষমা ও মহত্ত্ব: চরম শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ জয় করেছেন মানুষের হৃদয়। তলোয়ারের চেয়ে চারিত্রিক মাধুর্য বেশি কার্যকর।
- বিচক্ষণ রণকৌশল: রক্তপাত এড়ানোর জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং কৌশলগতভাবে শত্রুকে মানসিকভাবে পরাজিত করা একটি মহান কৌশল।

- সত্যের জয়: মূর্তি ভাঙার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়ছিলেন—*"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।"* এটিই ছিল এই বিজয়ের মূল বার্তা।
- বিনয়: বিজয়ী বেশে প্রবেশের সময়ও আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশ করা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

হুনায়ুন যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পরপরই অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও শত্রু পক্ষ:
মক্কা বিজয়ের পর আরবের শক্তিশালী হওয়াজিন ও সাকীফ গোত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করেছিল মুসলিমরা তাদের ওপর আক্রমণ করবে, তাই তারা আগেভাগেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। মালেক বিন আউফ আন-নাযরীর নেতৃত্বে প্রায় ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। তারা নারী, শিশু এবং গবাদিপশুও সাথে নিয়ে এসেছিল যাতে প্রাণভয়ে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে না পালায়।

২. মুসলিম বাহিনীর যাত্রা ও আত্মতুষ্টি:
রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বের হন। এর মধ্যে ১০,০০০ ছিলেন মদীনা থেকে আসা সাহাবী এবং ২,০০০ ছিলেন মক্কার নও-মুসলিম। মুসলিম বাহিনীর বিশাল সংখ্যা দেখে কারো কারো মনে সামান্য অহংকার বা আত্মতুষ্টির সৃষ্টি হয়েছিল। তারা বলেছিলেন, *"আজ আমরা সংখ্যার স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না।"* এই মানসিকতার কারণে আল্লাহ তাঁদের এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন।

৩. অতর্কিত আক্রমণ ও প্রাথমিক বিপর্যয়:

হুনাইন উপত্যকাটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও পাহাড়বেষ্টিত। হওয়াজিন গোত্রের তীরন্দাজরা আগে থেকেই পাহাড়ের আড়ালে ও গিরিপথে ওঁত পেতে ছিল। মুসলিম বাহিনী যখন ভোরে উপত্যকায় প্রবেশ করছিল, তখন শত্রুরা চারদিক থেকে অতর্কিত তীরের বৃষ্টি শুরু করে। এই আকস্মিক হামলায় মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং অনেকে পিছু হটতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে মাত্র ১০০ জনের মতো সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অটল বীরত্ব:

চরম বিশৃঙ্খলার মাঝেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর অটল ছিলেন এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছিলেন:

"আমি নবী, এটা মিথ্যা নয়; আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর!"

তিনি আব্বাস (রা)-কে উচ্চস্বরে আনসার ও মুহাজিরদের ডাকতে বলেন। তাঁর ডাক শুনে সাহাবীরা পুনরায় একত্রিত হতে শুরু করেন এবং পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুঠো মাটি নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুড়ে মারেন, যা অলৌকিকভাবে প্রত্যেক শত্রুর চোখে গিয়ে পড়ে।

৫. চূড়ান্ত বিজয় ও গণিমত:

মুসলিমদের পাল্টা আক্রমণে হওয়াজিন ও সাকীফ বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। তারা তাদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ, গবাদিপশু এবং পরিবার-পরিজন ময়দানে ফেলে যায়। এই যুদ্ধে ৬,০০০ বন্দি, ২৪,০০০ উট, ৪০,০০০ ছাগল এবং ৪,০০০ উকিয়া রূপা গণিমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয়। পালিয়ে যাওয়া শত্রুরা তায়েফ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

❁হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- সংখ্যার ওপর ভরসা নয়: বিজয়ের জন্য সৈন্য সংখ্যা বা অস্ত্রের আধিক্য যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করাই মূল বিষয়। মুসলিমদের প্রাথমিক বিপর্যয় এটিই শিক্ষা দেয়।
- নেতৃত্বের দৃঢ়তা: ঘোর বিপদের মুখেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অটল অবস্থান সাহাবীদের মাঝে নতুন করে সাহসের সঞ্চার করেছিল।
- বিজয় পরবর্তী ক্ষমা: যুদ্ধের পর হওয়াজিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এসে ক্ষমা চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দিয়ে এক অনন্য মানবিকতার পরিচয় দেন।
- ধৈর্যের ফল: বিপর্যয়ের পর ধৈর্য ধরে পুনরায় সংগঠিত হওয়া বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

তাবুক যুদ্ধ

হিজরি নবম সনের রজব মাসে ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ 'তাবুক যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণ:
মক্কা বিজয় এবং হুনাইন যুদ্ধের পর আরবে ইসলামের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেখে তৎকালীন বিশ্বশক্তি রোমান সাম্রাজ্য (বাইজেন্টাইন) আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া সীমান্তে বিশাল সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন এবং মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এই সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পরিবর্তে সরাসরি রোমানদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন।

২. কঠিন সময় ও পরীক্ষার মুহূর্ত:
তাবুক যুদ্ধের সময়টি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল:

- তীব্র গরম: আরবের মরুভূমিতে তখন প্রচণ্ড দাবদাহ চলছিল।

- খাদ্য ও পানির অভাব: মদীনায় তখন অভাব-অনটন চলছিল।
- ফসল কাটার সময়: খেজুর বাগানগুলোতে ফল পাকার সময় হওয়ায় অনেকে মদীনা ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলেন না। এই কঠিন পরিস্থিতির কারণে এই বাহিনীকে 'জাইশুল উসরাহ' বা 'অভাবী বাহিনী' বলা হয়।

৩. দান ও কুরবানীর অনন্য নজির:

যুদ্ধের বিশাল ব্যয়নির্বাহের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান:

- আবু বকর (রা): তাঁর ঘরের সমস্ত সম্পদ (৪,০০০ দিরহাম) নিয়ে আসেন।
- উমর (রা): তাঁর সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসেন।
- উসমান (রা): তিনি ৩১১টি উট, ১০০টি ঘোড়া এবং ১০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করে অভাবনীয় ত্যাগ স্বীকার করেন।
- দরিদ্র সাহাবী: অনেকে সামান্য শ্রম দিয়ে অর্জিত এক মুষ্টি খেজুরও দান করেছিলেন।

৪. তাবুকের দিকে যাত্রা ও মুনাফিকদের চরিত্র:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। এটিই ছিল তাঁর জীবদ্দশায় সবচেয়ে বড় বাহিনী। এই যাত্রায় মুনাফিকদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়; তারা গরমে ভয় পেয়ে এবং বিভিন্ন ওজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে, সত্যবাদী কিছু সাহাবী (যেমন কা'ব বিন মালেক) অবহেলাবশত পেছনে থেকে যাওয়ায় পরবর্তীতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

৫. তাবুকে অবস্থান ও রোমানদের পলায়ন:

মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে সিরিয়া সীমান্তের 'তাবুক' নামক স্থানে পৌঁছে ২০ দিন অবস্থান করেন। মুসলিমদের এই বিশাল বাহিনী এবং সাহসিকতার খবর শুনে রোমানরা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তারা লড়াই করার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পেছনে সরে যায়। ফলে কোনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছাড়াই মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয়।

৬. আঞ্চলিক গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি:

তাবুকে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশেপাশের বিভিন্ন খ্রিষ্টান ও ইহুদি গোত্রপ্রধানদের সাথে (যেমন: আয়লা, আজরুহ ও দুমাতুল জানদাল) শান্তি চুক্তি ও জিজিয়া কর প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে উত্তর আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং রোমানদের প্রভাব চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

❇তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- প্রতিকূলতায় ধৈর্য: চরম অভাব ও গরমেও যারা আল্লাহর পথে অটল থাকে, তারাই সফল।
- মুনাফিকদের বর্জন: কঠিন সময়েই প্রকৃত মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।
- বিনা যুদ্ধে বিজয়: মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং শৃঙ্খলাই শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চার করে, যা অনেক সময় তলোয়ারের চেয়ে বেশি কাজ করে।
- তওবার গুরুত্ব: যুদ্ধের পর পেছনে থেকে যাওয়া তিন সাহাবীর তওবা কবুলের ঘটনা থেকে আল্লাহর অসীম দয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

টপিক:০৯ - বিদায় হজ্জ

হিজরি দশম সনের যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সংকল্প ঘোষণা করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র এবং শেষ হজ্জ, যা ইতিহাসে 'বিদায় হজ্জ' বা 'হজ্জাতুল ওয়াদা' নামে পরিচিত। ধারাবাহিক বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

১. যাত্রার প্রস্তুতি ও মক্কার পথে:

হজ্জের ঘোষণা শুনে আরবের চারপাশ থেকে হাজার হাজার মানুষ মদীনায় সমবেত হন। যিলকদ মাসের ২৫ তারিখ রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করে চুলে তেল মেখে লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি এহরাম বাঁধেন। তাঁর সাথে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার (মতান্তরে আরও বেশি) সাহাবীর এক বিশাল কাফেলা ছিল। পুরো পথ তাঁরা উচ্চস্বরে 'লাব্বাইক' ধ্বনিতে মুখরিত করে রাখেন।

২. মক্কায় প্রবেশ ও তওয়াফ:

৪ঠা যিলহজ সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমেই কাবা শরীফ তওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমে নামাজ আদায় করেন। এরপর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ সম্পন্ন করেন। ৮ই যিলহজ (ইয়াউমুত তারবিয়াহ) তিনি সাহাবীদের নিয়ে মিনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে যোহর থেকে শুরু করে পরদিন ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন।

৩. আরাফাতের ময়দান ও ঐতিহাসিক ভাষণ:

৯ই যিলহজ সূর্যোদয়ের পর তিনি আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হন। সেখানে 'নামিরা' নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি তাবু তৈরি করা হয়। সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনি তাঁর বিখ্যাত উটনী 'কাসওয়া'র পিঠে চড়ে জাবালে রহমতের পাদদেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি ইসলামের মূল নীতিমালা ঘোষণা করেন:

- জীবনের নিরাপত্তা: "তোমাদের জান ও মাল আজকের এই দিন ও এই মাসের মতোই পবিত্র এবং হারাম।"

- আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিলুপ্তি: "জাহেলী যুগের সমস্ত প্রথা, রক্তের দাবি এবং সুদের কারবার আমার পায়ের নিচে দাফন করা হলো।"
- নারীদের অধিকার: "নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের ওপর তাদের যেমন অধিকার আছে, তাদের ওপরও তোমাদের তেমন অধিকার রয়েছে।"
- সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব: "অনিয়মিত কোনো আরবের ওপর অনারবের বা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া।"

৪. দ্বীনের পূর্ণতা ও আল্লাহর সাক্ষ্য:

ভাষণ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, *"আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি?"* জনতা সমস্বরে উত্তর দিল, *"হ্যাঁ, অবশ্যই!"* তখন তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন, *"হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো!"* ঠিক এই মুহূর্তেই কুরআনের সেই বিখ্যাত আয়াত নাযিল হয়:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম..." (সূরা মায়িদাহ: ৩)

৫. মুযদালিফা, মিনা ও কোরবানী:

আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পর তিনি মুযদালিফায় যান এবং সেখানে মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেন। ১০ই যিলহজ সকালে তিনি মিনায় ফিরে এসে 'জামারাতুল আকাবায়' কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি নিজের হাতে ৬৩টি উট কোরবানী করেন (বাকিগুলো আলী রা. সম্পন্ন করেন)। মাথা মুণ্ডন করে তিনি এহরাম খুলে হালাল হন এবং কাবা শরীফ গিয়ে তওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেন।

৬. মদীনায় প্রত্যাবর্তন:

আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের বিদায় জানিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে তিনি আলী (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মদীনায় পৌঁছানোর পর তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

❇বিদায় হজ্জ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা:

- ইসলামের পূর্ণতা: এই হজ্জের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধান ও ইবাদত পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে।
- মানবাধিকারের সনদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষণটি ছিল বিশ্বের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাধিকারের দলিল।
- বিদায়ে ইঙ্গিত: রাসূল ﷺ বারবার বলছিলেন, *"হয়তো আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে হজ্জ করার সুযোগ পাব না।"* এটি ছিল তাঁর বিদায়ের এক করুণ সংকেত।
- উম্মাহর ঐক্য: বর্ণ, ভাষা ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মুসলিম যে এক ও অভিন্ন ভাই-ভাই, বিদায় হজ্জ ছিল তার এক জীবন্ত প্রতিফলন।

শেষ বিদায়ের কাল

হিজরি একাদশ সনের রবিউল আউয়াল মাসে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোর হৃদয়স্পর্শী বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

১. অসুস্থতার সূচনা:
বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। সফর মাসের শেষ দিকে তিনি জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে শহীদদের জন্য দোয়া করেন। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁর প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও জ্বর শুরু হয়। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত নামাজে ইমামতি করেন। তবে শারীরিক অবস্থা আরও অবনতি হলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে আয়েশা (রা)-এর হুজরায় অবস্থান নেন।

২. শেষ উপদেশ ও সালাতের গুরুত্ব:

অসুস্থ থাকা অবস্থায় তিনি বারবার বলছিলেন, *"নামাজ, নামাজ! আর তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।"* তিনি আরও নির্দেশ দেন যেন উসামা বিন যায়েদ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে সিরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তিনি নিজে মসজিদে যেতে পারছিলেন না, তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল তাঁর পরে আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বের এক পরোক্ষ সংকেত।

৩. শেষবারের মতো মসজিদে আসা:

ইন্তেকালের তিন দিন আগে সোমবার ফজর নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে সাহাবীদের নামাজ পড়া দেখেন। সাহাবীদের সারিবদ্ধ নামাজ দেখে তাঁর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাহাবীরা মনে করেছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি মুচকি হেসে পর্দা টেনে দেন। এটিই ছিল সাহাবীদের সাথে তাঁর শেষ দেখা।

৪. জীবনের শেষ মুহূর্ত:

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সকালে তাঁর অসুস্থতা তীব্রতর হয়। তিনি একটি পাত্রে রাখা পানিতে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছছিলেন আর বলছিলেন, *"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুযন্ত্রণা অত্যন্ত কঠিন।"* এরপর তিনি মেসওয়াক চাইলেন এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে মেসওয়াক করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তাঁর মাথা তখন আমার বুকের ওপর হেলান দেওয়া ছিল। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন:

"বালির রফীকিল আ'লা" (বরং হে আল্লাহ! আমি সর্বোত্তম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই)

এই কথাটি বলার পরপরই তাঁর হাতটি নিচে নেমে আসে এবং তাঁর পবিত্র আত্মা মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৫. সাহাবীদের শোকাতুর অবস্থা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে মদীনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ওমর (রা) এতটাই শোকাহত ছিলেন যে তিনি তলোয়ার উঁচিয়ে বলতে থাকেন, "যে বলবে মুহাম্মদ ﷺ মারা গেছেন, আমি তার মাথা উড়িয়ে দেব।" এই কঠিন মুহূর্তে আবু বকর (রা) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেন। তিনি সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে, তারা জেনে রাখো মুহাম্মদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করো, তারা জেনে রাখো আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।"

এরপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলে সাহাবীদের মধ্যে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

৬. গোসল, জানাজা ও দাফন:

মঙ্গলবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গোসল করানো হয় এবং কোনো ইমাম ছাড়াই সাহাবীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর জানাজা আদায় করেন। আবু বকর (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী (নবীগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁদের দাফন করা হয়) আয়েশা (রা)-এর হুজরাতেই তাঁর কবর খনন করা হয়। বুধবার রাতে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁকে দাফন করা হয়।

❇ এই শোকাবহ ঘটনা থেকে শিক্ষা:

- মৃত্যু অনিবার্য: মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে, যা আল্লাহর অমোঘ বিধান।
- সালাতের মর্যাদা: জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নামাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ ইবাদত।
- আবু বকর (রা)-এর প্রজ্ঞা: শোকের মুহূর্তে তাঁর ধীরস্থির নেতৃত্ব উম্মাহকে এক বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিল।
- সুন্নাহর অনুসরণ: রাসূল ﷺ চলে গেলেও তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে রয়ে গেছে।

টপিক:১০ - নবীজির পবিএ আখলাক ও আমল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম আখলাক (চরিত্র) এবং নিয়মিত আমলগুলোর বিস্তারিত তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ২০টি পবিত্র আখলাক:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব রূপ। তাঁর ২০টি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো:

১/পরম সততা: নবুয়তের আগেও কাফেররা তাঁকে 'আল-আমিন' বা পরম বিশ্বাসী বলে মানত।

২/অসীম ক্ষমা: মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতনকারীদেরও বিনাশর্তে ক্ষমা করেছিলেন।

৩/নম্রতা ও বিনয়: তিনি সাধারণ মানুষের মতো মাটিতে বসে খাবার খেতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।

৪/অটল ধৈর্য: তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েও তিনি বদদোয়া না করে তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেছিলেন।

৫/দানশীলতা: তিনি কখনও কোনো যাচনাকারীকে 'না' বলতেন না। যা থাকত সবই বিলিয়ে দিতেন।

৬/লজ্জাশীলতা: তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন।

৭/নির্ভীক বীরত্ব: যুদ্ধের ভয়াবহ মুহূর্তে যখন সবাই বিচলিত হতো, তিনি পাহাড়ের মতো অটল থাকতেন।

৮/মায়া ও মমতা: তিনি শিশু ও প্রাণীদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। শিশুদের দেখলে কপালে চুমু খেতেন।

৯/ন্যায়বিচার: বিচারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি বলেছিলেন, "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।"

১০/বিচক্ষণতা: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

১১/অল্পে তুষ্টি: মাসের পর মাস তাঁর ঘরে চুলা জ্বলত না, কেবল খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কাটাতেন।

১২/মধুর ভাষণ: তিনি কখনও কটু কথা বলতেন না। তাঁর কথা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী।

১৩/আমানতদারি: শত্রুরাও তাঁদের মূল্যবান সম্পদ রাসূল ﷺ-এর কাছে গচ্ছিত রাখত।

১৪/ওয়াদা রক্ষা: চুক্তির শর্ত পালনে তিনি ছিলেন কঠোর। শত্রু হলেও তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি।

১৫/সাম্য: ভৃত্য বা গোলামদের সাথে একই ধরনের খাবার ও পোশাক ভাগ করে নিতেন।

১৬/পারিবারিক সদ্ব্যবহার: স্ত্রীদের সাথে তিনি অত্যন্ত হাসিখুশি ও রোমান্টিক সময় কাটাতেন।

১৭/প্রতিবেশীর হক: অমুসলিম প্রতিবেশীদেরও তিনি নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন ও সেবা করতেন।

১৮/অহংকারহীনতা: কেউ তাঁর প্রশংসা করলে তিনি তা পছন্দ করতেন না, বরং নিজেকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় দিতেন।

১৯/ধীরস্থিরতা: তিনি তাড়াহুড়ো পছন্দ করতেন না। প্রতিটি কাজ অত্যন্ত গুছিয়ে ও শান্তভাবে করতেন।

২০/হেদায়েতের আকুলতা: মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সারারাত কাঁদতেন এবং ব্যাকুল হয়ে দাওয়াত দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ২০টি নিয়মিত আমল:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈনন্দিন ইবাদত ও আমলগুলো ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং ভারসাম্যপূর্ণ:

১/তাহাজ্জুদ সালাত: রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন।

২/মিছওয়াক করা: ঘুম থেকে উঠে, নামাজের আগে এবং ঘরে প্রবেশের সময় তিনি নিয়মিত মিছওয়াক করতেন।

৩/যিকির ও ইস্তিগফার: তিনি প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০ থেকে ১০০ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

৪/কুরআন তিলাওয়াত: তিনি প্রতিদিন অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এবং সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ করতেন।

৫/সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা: তিনি প্রতি সপ্তাহে এই দুই দিন নিয়মিত রোজা রাখতেন।

৬/আইয়ামে বিয-এর রোজা: প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তিনি রোজা রাখতেন।

৭/আযান ও নামাজের প্রস্তুতি: আযান হওয়ার সাথে সাথে তিনি দুনিয়াবী সব কাজ ছেড়ে নামাজের জন্য প্রস্তুত হতেন।

৮/জামাআতে নামাজ: অসুস্থতা ছাড়া তিনি কখনোই জামাআত ত্যাগ করেননি।

৯/ডান দিককে প্রাধান্য: কাপড় পরা, মসজিদে ঢোকা বা যেকোনো ভালো কাজে তিনি ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

১০/মসজিদে অবস্থান: ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি মসজিদে যিকির ও ইলমি আলোচনায় কাটাতেন।

১১/আদব শিক্ষা দেওয়া: খাওয়ার সময় ডান হাত দিয়ে খাওয়া এবং সামনে থেকে খাওয়ার শিক্ষা দিতেন।

১২/পরিমিত আহার: তিনি পেট ভরে কখনও খাবার খেতেন না। পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য রাখতেন।

১৩/কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম): যোহরের আগে বা পরে তিনি অল্প সময় বিশ্রাম নিতেন।

১৪/পরিবারের খোঁজ নেওয়া: আসরের পর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের ঘরে গিয়ে কুশল বিনিময় করতেন।

১৫/দোয়া করা: ঘুমানোর আগে, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং প্রতিটি কাজের শুরুতে নির্দিষ্ট দোয়া পড়তেন।

১৬/মানুষের সেবা: অসুস্থ সাহাবীদের দেখতে যাওয়া এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা ছিল তাঁর নিয়মিত কাজ।

১৭/পরামর্শ (শুরা): গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো কাজে তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

১৮/বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা: তিনি অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলতেন এবং দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন।

১৯/মুসাফাহা ও সালাম: কারো সাথে দেখা হলে আগে সালাম দিতেন এবং মুসাফাহা (হাত মেলানো) করতেন।

২০/সাদকা ও দান: তাঁর কাছে কোনো অতিরিক্ত সম্পদ এলে তা রাত হওয়ার আগেই অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পবিত্র আখলাক ও আমলগুলো কেবল জানার জন্য নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করাই সীরাত পাঠের মূল সার্থকতা। আল্লাহ আমাদের নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

টপিক: ১১ - আহলে বাইত স্ত্রী সন্তান ও নাতি নাতনিগন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার বা 'আহলে বাইত' ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থ অনুসারে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ (উম্মাহাতুল মুমিনীন), সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. পবিত্র স্ত্রীগণ (উম্মাহাতুল মুমিনীন):
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতা। তাঁরা ছিলেন জ্ঞান, ধৈর্য ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক।

- খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা): প্রথম স্ত্রী, যিনি নবুয়তের পর প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলামের পথে উৎসর্গ করেন।

- সওদা বিনতে যামআ (রা): খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের পর রাসূল ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন।

- আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা): ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নারী জ্ঞানবেত্তা। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

- হাফসা বিনতে উমর (রা): উমর (রা)-এর কন্যা, যিনি পবিত্র কুরআনের হিফজ ও সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছিলেন।

- যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রা): দানশীলতার জন্য তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' (মিসকিনদের মাতা) বলা হতো।

- উম্মে সালামা (রা): অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী নারী ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল।

- যয়নাব বিনতে জাহশ (রা): রাসূল ﷺ-এর ফুফাতো বোন। ইবাদত ও দান-সদকায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন।

- জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা): বনু মুস্তালিক গোত্রের নেতার কন্যা। তাঁর কারণে তাঁর পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

- উম্মে হাবীবা (রা): আবু সুফিয়ানের কন্যা, যিনি ইসলামের জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

- সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা): খাইবার যুদ্ধের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নবীজির স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা পান।

- মায়মুনা বিনতে হারিস (রা): তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর শেষ বিবাহিত স্ত্রী।

- মারিয়া কিবতিয়া (রা): মিসরের অধিপতি মুকাউকিস তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের জননী।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তানগণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোট ৭ জন সন্তান ছিলেন। ইব্রাহীম (রা) ছাড়া বাকি সব সন্তান খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্ম নেন।

পুত্র সন্তান:

- ১. কাসেম (রা): তাঁর নামানুসারেই রাসূল ﷺ-এর কুনিয়াত ছিল 'আবুল কাসেম'। শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন।
- ২. আব্দুল্লাহ (রা): তাঁকে 'তৈয়ব' ও 'তাহের' বলা হতো। তিনিও শৈশবে ইন্তেকাল করেন।
- ৩. ইব্রাহীম (রা): মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভে জন্ম নেন। তিনিও শিশুকালেই ইন্তেকাল করেন।

কন্যা সন্তান:

- ১. যয়নাব (রা): বড় কন্যা। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আবুল আস বিন রাবীর সাথে।
- ২. রুকাইয়া (রা): তাঁর বিবাহ হয়েছিল উসমান (রা)-এর সাথে। মদীনায় হিজরতের পর বদর যুদ্ধের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।
- ৩. উম্মে কুলসুম (রা): রুকাইয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পর উসমান (রা) তাঁকে বিবাহ করেন। (এজন্য উসমান রা.-কে 'যুন-নুরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়)।
- ৪. ফাতিমা (রা): রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। তাঁর বিবাহ হয় আলী (রা)-এর সাথে। তাঁর মাধ্যমেই রাসূল ﷺ-এর বংশধারা জারি রয়েছে।

৩. নাতি ও নাতনিগণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্রগণ তাঁর অত্যন্ত আদরের ছিলেন। বিশেষ করে আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর সন্তানদের তিনি 'জান্নাতের যুবকদের সর্দার' বলে ঘোষণা করেছেন।

- হাসান বিন আলী (রা): বড় নাতি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দূরদর্শী ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য তিনি খেলাফত ত্যাগ করেন।

- হুসাইন বিন আলী (রা): ছোট নাতি। কারবালার প্রান্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

- যয়নাব বিনতে আলী (রা): নাতনি। কারবালার ঘটনার পর তিনি ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

- উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা): নাতনি। পরবর্তীতে উমর (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

- উমামাহ বিনতে আবুল আস: রাসূল ﷺ-এর বড় মেয়ে যয়নাব (রা)-এর কন্যা। রাসূল ﷺ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং অনেক সময় নামাজে থাকা অবস্থায়ও তাঁকে কাঁধে নিতেন।

❇আমাদের জন্য শিক্ষা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমানের অংশ। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা পারিবারিক পবিত্রতা, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দ্বীনের পথে অটল থাকার শিক্ষা পাই। রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেমন উত্তম আচরণ করতেন, তেমনি সন্তানদের ও নাতি-নাতনিদের সাথে খেলাধুলা ও মায়া-মমতা করতেন, যা আমাদের জন্য সুন্নাহ।

টপিক:১২ - রাসূল ﷺ এর নামসমূহ, বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক গঠন ও অবয়ব।

রাসূল ﷺ এর নামসমূহ:

রাসূল ﷺ এর বিশেষত্বের কথা বললে প্রথমেই তাঁর নামের কথা বলা প্রয়োজন।
জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) থেকে সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ; আমি আল মাহি যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেছেন; আমি আল হাশির, মানুষ আমার পেছনে পুনরুত্থিত হবে; আমি আল আকিব, যার পরে আর কোন নবী নেই।"
ভিন্ন একটি বর্ণনায় রয়েছে, "এবং আমি নবিয়্যুর রাহমাহ, নবিয়্যুত তাওবাহ, আল মুকাফফাহ এবং নবিয়্যুল মালাহিম"। কুরআনে রাসূল ﷺ এর দুটি নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে-
১) মুহাম্মাদ (কুরআনে ৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ২) আহমাদ (ঈসা আঃ এর জবানে কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে) রাসূল ﷺ এর নামগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের জানা উচিত।

মুহাম্মাদ (**محمد**):

মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ সর্বাধিক পরিমাণে (Highest Quantity) প্রশংসিত। অর্থাৎ যাকে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়।

স্বয়ং আল্লাহ, ফেরেশতাকুল, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং পৃথিবীর সকল মানুষ (হাতে গোণা কিছু মানুষ ব্যতীত) তাঁর প্রশংসা করে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মুহূর্তে আযানের মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ এর নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর চেয়ে অধিক প্রশংসার হকদার আর কেউ নেই। আর এটাই মুহাম্মাদ নামের তাৎপর্য।

আহমাদ (**احمد**):

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আহমাদ অর্থ সর্বোত্তম মানে (গুণে) (Highest Quality) প্রশংসিত। রাসূল ﷺ এর প্রশংসার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ যে ভাষাশৈলী ও শব্দাবলী দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তাঁর চেয়ে উত্তম মানের প্রশংসা কাউকে করা যেতে পারে না আর না কেউ তার হকদার।

আল মাহি (**الماحي**):

আল মাহি অর্থ ‘যে কোনকিছুকে মুছে ফেলে’। রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে শিরক ও কুফরকে মুছে ফেলা হয়েছে। এজন্য তাঁর নাম আল মাহি।

আল হাশির (**الحاشر**):

আল হাশির অর্থ ‘যার পেছনে একত্রিত করা হয়’। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ কে পুনরুত্থিত করা হবে এবং সমগ্র মানবজাতি তাঁর পথে উত্থিত হবে। এজন্য তাঁর একটি নাম আল হাশির।

আল আকিব (**العاقب**):

আল আকিব অর্থ ‘কোন ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে যিনি আসেন’। রাসূল ﷺ নবী ও রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে এসেছেন এবং তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

অর্থঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।
(সূরা আহযাব, ৩৩:৪০)
এজন্য তাঁর একটি নাম আল আকিব।

নবিয়্যুর রাহমাহ (**نبي الرحمة**):
নবিয়্যুর রাহমাহ অর্থ 'রহমতের নবী'। রাসূল ﷺ কে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।
(সূরা আল আম্বিয়া, ২১:১০৭)

নবিয়্যুত তাওবাহ (**نبي التوبة**):
নবিয়্যুত তাওবাহ অর্থ 'তাওবাহ-র নবী'। রাসূল ﷺ কে কেউ মেনে নিয়ে তাওবাহ করে যদি ইসলামের পথে ফিরে আসে তবে সে দুনিয়া পরকালে সফলকাম হবে। তাই তিনি নবিয়্যুত তাওবাহ।

আল মুকাফফাহ (**المقفى**):
আল মুকাফফাহ অর্থ 'যিনি কোনকিছুকে পূর্ণতা দেন'। রাসূল ﷺ এর আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বাণী ও রিসালাতের পূর্ণতা পেয়েছে। এজন্য তিনি আল মুকাফফাহ।

নবিয়্যুল মালাহিম (**نبي الملاحم**):
নবিয়্যুল মালাহিম অর্থ 'ফিতনার নবী'। রাসূল ﷺ এর আগমনই কিয়ামতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং কিয়ামতের পূর্বে আসবে প্রচুর পরিমাণে ফিতনা, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। এছাড়াও কিয়ামতের পূর্বে একের পর এক ফিতনার আবির্ভাব হবে। এজন্য তিনি নবিয়্যুল মালাহিম।

রাসূল ﷺ এর কুনিয়াত বা উপনাম:

রাসূল ﷺ এর সর্বাধিক পরিচিত কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম। তাঁর বড় পুত্র কাসিমের নাম থেকেই এই নাম এসেছিল। তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়াত ছিল আবু ইবরাহিম। রাসূল ﷺ এর ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়া এর গর্ভজাত সন্তান ইবরাহিম এর নাম থেকে এই নাম এসেছিল। কাসিম ও ইবরাহিম উভয়েই শিশু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

রাসূল ﷺ এর বিশেষত্বের আলোচনা করলে তাঁর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা চলে আসে যেগুলো একান্তভাবে শুধু তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। এগুলোকে বলা হয় 'খাসাইস' (**خصائص**)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১। রাসূল ﷺ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

অর্থঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

(সূরা আল আহযাব, ৩৩:৪০)

২। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে নির্দিষ্ট কোন এলাকা এবং জনগোষ্ঠীর জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ কে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ ও জ্বীনের জন্য। আল্লাহ বলেন-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ...

অর্থঃ ... বলে দাও, হে মানব মন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল (সূরা আল আরাফ, ৭:১৫৮)

৩। রাসূল ﷺ কে দেওয়া হয়েছিল 'রুব'। অর্থাৎ তিনি কোন অভিযানে বের হলে শত্র শিবিরে পৌঁছানোর এক মাসের দূরত্বে থাকতেই শত্রুদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেওয়া হত।

৪। রাসূল ﷺ কে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বড় উপহার। এর পূর্বে আর কোন নবীকে এত বড় উপহার দেওয়া হয়নি।

৫। রাসূল ﷺ কে দেওয়া হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা- আল কুরআন। এর সমতুল্য অন্য কোন মুজিযা পূর্ববর্তী কোন নবী- রাসূলকে দেওয়া হয়নি।

৬। ইসরা ও মিরাজ।

৭। আদম আঃ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নেতা তিনি। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি সমগ্র বনী আদমের নেতা।"

৮। রাসূল ﷺ কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর কবর থেকে পুনরুত্থিত করা হবে। এজন্যই তাঁর একটি নাম আল হাশির।

৯। রাসূল ﷺ কে 'হাউজে কাওসার' দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে হয়নি। এই হাউজের আকার এত বড় যে এর এক প্রান্ত মক্কা থেকে সান'আ পর্যন্ত বিস্তৃত (সমগ্র আরব ভূখণ্ডের অর্ধেক)।

১০। রাসূল ﷺ সিরাতের উপর দিয়ে সর্বপ্রথম অতিক্রম করবেন, সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বেন, তাঁর জন্যই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে এবং তাঁর উম্মাহ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১১। আল্লাহ রাসূল ﷺ কে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ শিখরে স্থান দিবেন। জান্নাতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ হল জান্নাতুল ফিরদাউস আর জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্থান হল 'আল ফাদিলাহ'। এই স্থানটি সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে কেবলমাত্র একজন মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট- আর তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমরা প্রতিটি আযানের জবাবে রাসূল ﷺ এর জন্য এই দোয়াই করে থাকি।

রাসূল ﷺ এর দৈহিক গঠন ও অবয়ব:

রাসূল ﷺ এর সার্বিক দৈহিক গঠন ও অবয়ব সম্পর্কে জানার আগে একটি ঘটনা ও সেই সংক্রান্ত হাদীসটি জেনে নেওয়া আমাদের জন্য উপকারী হবে।

রাসূল ﷺ, আবু বকর রাঃ, আমির বিন ফুহাইরাহ রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন উরাইকাত (পথপ্রদর্শক) হিজরতের সময় পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মরুভূমির মাঝে একটি তাঁবুতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত জনৈকা বৃদ্ধার (তার নাম- উম্মে মাবাদ রাঃ, তিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন) কাছে তিনি খাদ্য চাইলে বৃদ্ধা জানালেন যে তার কাছে খেতে দেওয়ার মত কিছুই নেই।

অদূরে একটি হাড় জিরজিরে শুকনো বকরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বৃদ্ধার কাছে সেটির দুধ দোহন করার অনুমতি নিলেন। বৃদ্ধা হতাশার সাথে অনুমতি দিলেন। রাসূল ﷺ বকরির ওলানে হাত দেওয়ার সাথে সাথে তা স্ফীত হয়ে উঠল এবং রাসূল ﷺ একটি বড় বাটি ভর্তি দুধ দোহন করলেন। সেটি বৃদ্ধাকে খেতে দিয়ে এরপর পুনরায় দোহন করলেন এবং নিজে ও সঙ্গীদের খেতে দিলেন। এরপর পুনরায় দোহন করে এক বাটি ভর্তি দুধ বৃদ্ধার কাছে রেখে বিদায় নিলেন। পরবর্তীতে বৃদ্ধার স্বামী আবু মাবাদ রাঃ (তিনিও পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিলেন) ঘরে ফিরলে বৃদ্ধা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার স্বামীকে জানায়। সব শুনে স্বামী কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। উম্মে মাবাদ তখন তার স্বামীকে রাসূল ﷺ এর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাকে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অনুপম বর্ণনা বললেও ভুল হবে না।

উম্মে মাবাদ এর বর্ণনা শোনার আগে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে, উম্মে মাবাদ রাঃ যখন রাসূল ﷺ কে দেখেন তখন তিনি মরুভূমির দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত-শ্রান্ত-ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায়ও একটি মানুষ কতটা অপরূপ হতে পারে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ উম্মে মাবাদ রাঃ এর এই বর্ণনা-

رَأَيْتُ رَجُلً

একজন মানুষকে দেখলাম।

ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ

চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্ন।

أَبْلَجَ الْوَجْهِ

আলোকোজ্জ্বল মুখ।

حَسَنَ الْخَلْقِ

সর্বোত্তম দেহসৌষ্ঠব।

لَمْ تَعِبْهُ تُجْلَةٌ

পেট অস্বাভাবিক মোটা নয়।

و لَمْ تُزْرِ بِهِ صَعْلَةٌ

মাথার আকার দৃষ্টিকটু ছোট নয়।

وَسِيمٌ

চেহারা জীর্ণশীর্ণ দেখালেও প্রশান্তি হারায় না।

قَسِيمٌ

সর্বাঙ্গ জীর্ণশীর্ণ দেখালেও প্রশান্তি হারায় না।

فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ

তাঁর চোখে ছিল একটি বৈপরীত্য।

و فِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ

তাঁর চোখের পাতার লোম লম্বা।

و فِي صَوْتِهِ صَحَلٌ

তাঁর কণ্ঠে ছিল না কর্কশতা।

و فِي عُنُقِهِ سَطَعٌ

তাঁর গলা ছিল পরিমিত লম্বা।

و فِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ

তাঁর দাড়ি ছিল পরিপূর্ণ এবং ঘন।

أَحْوَرُ

কালো অংশ কুচকুচে কালো, সাদা অংশ ধবধবে সাদা।

أَكْحَلُ

মনে হয় যেন চোখের পাতায় সুরমা লাগানো।

أَزَجُّ

ভ্রু ছিল মোটা এবং ধনুকের মতো বাঁকানো।

أَقْرَنُ

দুই ভ্রুর মাঝে জোড়া ছিল না।

شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ

চুল কুচকুচে কালো।

إِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ

যখন নীরব থাকতেন তখন এক শ্রদ্ধাপূর্ণ গাম্ভীর্য ভর করত।

و إِذَا تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ

কথা বলার সময় চমৎকার, ঝলমলে।

أَجْمَلُ النَّاسِ وَ أَبْهَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ وَ أَحْسَنُهُ وَ أَحْلَاهُ مِنْ قَرِيْبٍ

দূর থেকে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও স্মার্ট, কাছে থেকে মনে হতো তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ।

حُلْوُ الْمَنْطِقِ

মুখের কথা ছিল সুমিষ্ট, পরিষ্কার, যৌক্তিক।

فَصْلٌ لَا نَزْرٌ وَ لَا هَذَرٌ

কথার মাঝে ছিল স্বচ্ছতা; কথা না ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট আর না ছিল অপ্রয়োজনীয় লম্বা।

كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ

তাঁর কথা শুনে মনে হতো যেন নেকলেস থেকে একের পর এক মুক্তো খুলে পড়ছে।

رَبْعَةٌ

মধ্যম গড়নের।

لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ وَ لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولٍ

তাঁর দিকে তাকানোর জন্য মাথা নিচু করতে হতো না আবার উঁচুও করতে হতো না।

غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ، فَهُوَ أَنْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَ أَحْسَنُهُمْ قَدْرًا

তিনি ছিলেন দুই ডালের মধ্যে একটি ডাল; অনেকের মধ্যে থাকলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র

لَهُ رُفَقَاءُ يَحِفُّونَ بِهِ، إِذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ وَ إِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ

তাঁর চারপাশে একদল সাহাবী ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন আর যখন তিনি কিছু আদেশ করতেন তখন তাঁরা তা পালনের জন্য ছুটে যেতেন

مَحْفُودٌ، مَحْشُودٌ،

তাঁর যত্নের ঘাটতি ছিল না, চারপাশে সাহাবীদের ভিড় লেগে থাকত

لَا عَابِسٌ

তাঁর মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল না

وَ لَا مُفَنَّدٌ

আর না তিনি ছিলেন বাচাল।

টপিক: ১৩ - রাসূল (সা) এর দিনলিপি ও দৈনন্দিন আমল

মধ্যরাত ও ভোর:

- মধ্যরাতে বা এর কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতেন।
- এরপর মেসওয়াক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরান এর ১৯০-২০০ আয়াত পাঠ করতেন।
- ওযু সম্পন্ন করতেন।
- এরপর কিছুক্ষণ যিকির করে ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন।
- রাতের ১/৬ বাকি থাকতে তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় ডান কাত হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে শুয়ে থাকতেন।
- বিলাল (রা) এর আযানের শব্দে তিনি উঠে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন।
- এরপর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

সকাল:

- ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকিরে মশগুল হতেন।
- যিকিরের পর সাহাবীদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের কথোপকথন শুনতেন।
- কখনও কখনও সাহাবীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন, কেউ অসুস্থ থাকলে তার খবর নিতেন।
- এভাবে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অতিবাহিত করতেন।

সকাল ও দুপুরের মাঝে:

- মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।
- সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় তিনি মসজিদে ফিরে আসতেন এবং ২ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।

- এরপর সাহাবীদের সাথে আলাপ করতেন, তাঁদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন ও শিক্ষা দিতেন, নাসীহা করতেন।
- কখনও কখনও ছোট শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত, তিনি শিশুদের জন্য দোয়া করতেন।
- বেদুঈনরা দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে এসময়ে আসত এবং মদীনার বাইরের প্রতিনিধিদলও এসময়ে আসতেন।
- জরুরী মুহূর্তে এই সময়টায় পরামর্শসভা বসত। মজলিস শেষে সাহাবীগণ কেউ কেউ জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়তেন, কেউবা বাসায় বিশ্রাম নিতেন।
- নবীজি কখনও বাসায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, কখনও মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।
- কারও দাওয়াত থাকলে দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন বা কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে দেখতে যেতেন।

দুপুর:

- সকালের শেষে দুপুর গড়িয়ে এলে নবীজি স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর সাথে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন।
- ঘরে ঢুকে মেসওয়াক করে সবাইকে সালাম দিতেন।
- এরপর দুহর সালাত আদায় করতেন এবং নাস্তা করতেন।
- এই সময়টা পরিবারের সাথে একান্তে কাটাতেন।
- অন্য মুসলিম নারীগণ মেয়েদের ব্যক্তিগত মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে আসতেন এই সময়।
- কখনও কখনও ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ আসতেন।
- নবীজি সাংসারিক কাজ করতেন এই সময়ে। তিনি নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই করতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন।
- যুহরের সালাতের আগে পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতেন।

দুপুর ও বিকালের মাঝে:

- ঘুমিয়ে থাকলে যুহরের আযানের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙত।
- ওযু করে তিনি যুহরের ৪ রাকাত সুন্নাহ সালাত ঘরেই আদায় করতেন।

- এসময় মাঝে মাঝে হাসান-হুসাইন তাঁর সাথে খেলতে আসত।
- যুহরের জামাতের জন্য বিলাল (রা) ডাক দিলে তিনি মসজিদে যেতেন।
- কখনও আবার হাসান বা হুসাইনকে কোলে নিয়েও মসজিদে যেতেন।
- সালাতের পর সাহাবীদের নিয়ে ঘুরে বসতেন এবং তাঁদেরকে নাসীহা করতেন।
- কখনও কখনও এই সময়ে মদীনার বাহির থেকে প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করতে আসত।
- এরপর ঘরে ফিরে যুহরের ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করে কিছুক্ষণ পর আবার মসজিদে চলে যেতেন।
- আসর পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাতেন।

বিকাল:

- আসরের সালাত আদায় করে সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং কখনও কখনও খুব সংক্ষিপ্ত নাসীহা করতেন।
- যুহরের তুলনায় আসরের পর নবীজি অনেক কম কথা বলতেন।
- আসরের সালাত শেষ করে তিনি একে একে সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের সাথে খুনসুটি করতেন।
- এরপর সেদিন যার ঘরে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। কখনও আবার যার ঘরে থাকার পালা থাকত সকল স্ত্রী তাঁর ঘরে জমা হতেন।
- তিনি এসময়ে স্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন, তাঁদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অত্যন্ত আনন্দঘন পারিবারিক আবহে তিনি এ সময়টা কাটাতেন।
- কখনও আবার সাহাবীরা তাঁকে আসরের পর দাওয়াত দিতেন। তিনি দাওয়াত কবুল করতেন।

সন্ধ্যা:

- মাগরিবের সালাত নবীজি সংক্ষিপ্ত করতেন।
- মাগরিবের সালাতের পর সাহাবীদের সাথে সাধারণতঃ কথা বলতেন না। ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন। এরপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন।
- তবে সিয়াম থাকলে মাগরিবের সালাতের পূর্বেই ইফতার করে নিতেন।

- পর্যাপ্ত খাবার থাকলে তিনি অন্ততঃ ১০ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন, যদিও বেশীরভাগ সময় তিনি খাদ্যের অভাবে অভুক্তই থাকতেন।
- সাহাবীদের নিয়ে খাওয়ার সময় তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।
- স্ত্রীদের সাথে খাবার গ্রহণকালে তিনি সরস কথোপকথন চালাতেন।

রাত:

- ইশার সালাতের আগ পর্যন্ত নবীজি ঘরেই থাকতেন।
- ইশার সালাত কিছুটা দেরিতে আদায় করতেন।
- ইশার সালাতের পর সাহাবীদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন। যেদিন বলতেন সেদিনও অনেক সংক্ষেপে কথা শেষ করতেন।
- ইশার সালাত শেষ করে ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন।

রাতে ঘুমের আগে:

- এরপর স্ত্রীর সাথে খোশ-গল্পে সময় কাটাতেন।
- মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথেও সময় কাটাতেন আবার কিছু রাতে আনসারদের সাথে সময় কাটাতে যেতেন।
- বাসায় ফিরে তিনি স্ত্রীর সাথে কিছু সময় গল্প করতেন এবং কখনও প্রয়োজন বোধ করলে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতেন।
- এরপর পবিত্রতা অর্জন করে তিনি ঘুমের দোয়া পড়তেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন।
- রাতে ঘুম ভেঙে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।
- তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।

উপসংহার

মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সিরাহ বা জীবনীর ওপর বক্ষ্যমাণ থ্রীসিসটির আলোচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণায় তাঁর পবিত্র জন্ম, নবুয়ত লাভ, মক্কার কঠিন দিনগুলো অতিক্রম করে মদিনায় হিজরত এবং পরবর্তী সময়ে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রতিটি স্তর বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মদিনার প্রাথমিক দিনগুলোর সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণ এবং বদর, উহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো যুগান্তকারী কূটনৈতিক পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে তিনি যেভাবে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা এই গবেষণায় সবিস্তারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মক্কা বিজয় এবং বিদায় হজ্বের ভাষণের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য যে শাশ্বত অধিকার ও সাম্যের বার্তা রেখে গেছেন, তা সমকালীন বিশ্বব্যবস্থার জন্য এক অনন্য পথপ্রদর্শক। ঐতিহাসিক এই ঘটনাবলির পাশাপাশি তাঁর পবিত্র আখলাক, দৈনন্দিন আমল, দিনলিপি এবং আহলে বাইত তথা তাঁর পরিবার ও সন্তানদের প্রতি তাঁর আচরণ বর্তমান পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠনের জন্য সর্বোত্তম অনুকরণীয় আদর্শ।

তাঁর পবিত্র নামসমূহ, অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক গঠন ও অবয়বের আলোচনা মূলত তাঁর প্রতি মুমিন হৃদয়ের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধকে আরও গভীর করে তোলে।

বর্তমান বিশ্বের নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়ের এই ক্রান্তিলগ্নে সিরাহ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন কেবল অতীতের কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্র নয়, বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। বক্ষ্যমাণ এই গবেষণার প্রধান প্রাপ্তি হলো—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান আদর্শ ও দিনলিপিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন সম্ভব, এই চিরন্তন সত্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে এই বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক কাজটিকে কবুল করেন এবং সকলকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নাহ ও আদর্শকে নিজেদের বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলন ঘটানোর তৌফিক দান করেন।

(আমীন)

সোর্স (রেফারেন্স)

বই :
আর-রাহীকুল মাখতুম।
নবীয়ে রহমত।
রেইনড্রপ সিরাহ।
নবীজির ঘর সংসার।